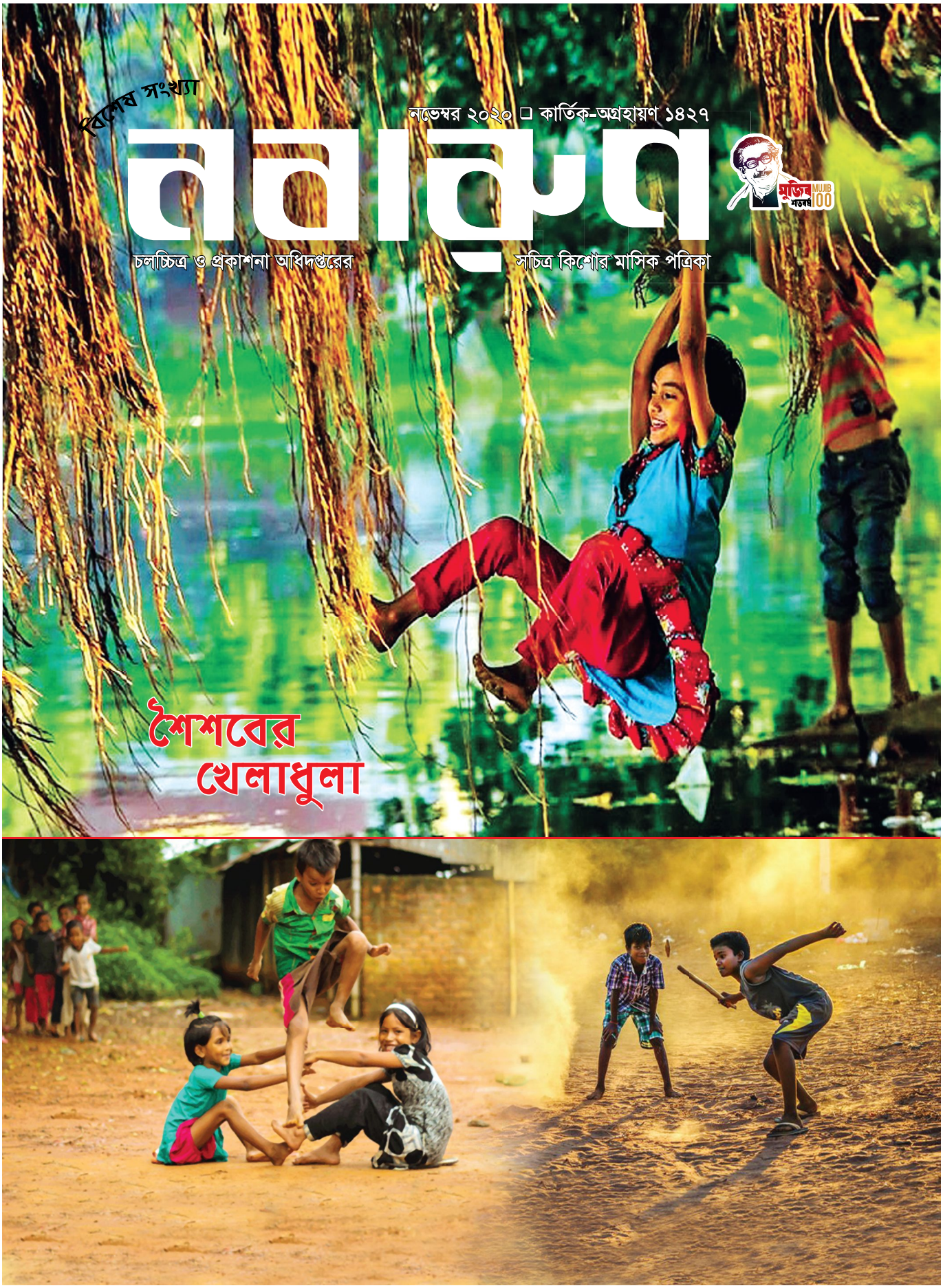

বিশেষ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২০ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭
নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
শৈশবের খেলাধুলা

আব্দুর রাআদ নাফিউ, ২য় শ্রেণি, নিউ ব্লোন এন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

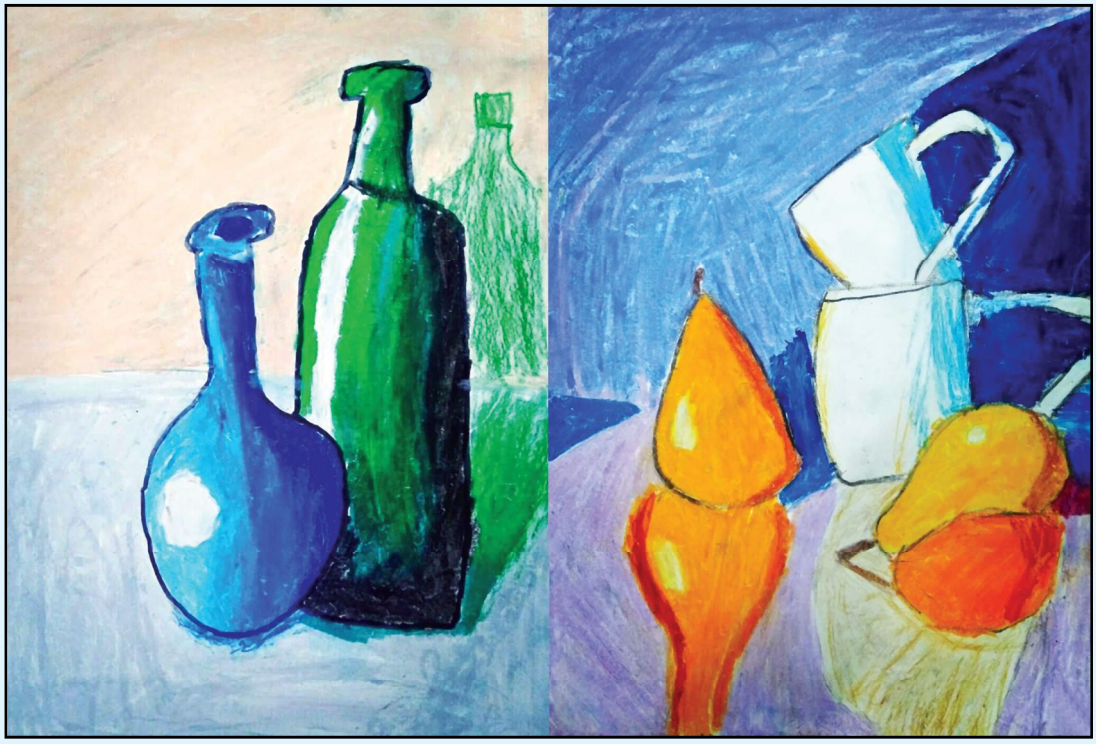

মাসরুর সাফির, ৪র্থ শ্রেণি, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নভেম্বর ২০২০ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদকীয়

জাতীয় জীবনে ৩রা নভেম্বর একটি শোকাবহ দিন। ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমরা ৩রা নভেম্বরের শহিদদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এ দুই মাস হচ্ছে হেমন্তকাল। হেমন্ত নিয়ে আসে শীতের পূর্বাভাস আর নবান্ন। নবান্ন মানে নতুন অন্ন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব।

নবারুণের বন্ধুরা, নভেম্বরের এ সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি আবহমান গ্রামবাংলার প্রিয় খেলাগুলো নিয়ে। বিশেষ করে তোমাদের কথা ভেবেই। কারণ সেকালের অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলা যা এখন আমরা হারাতে বসেছি। হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলো যেমন: কাবাডি, কুতকুত, কানাকাছি, দড়িলাফ, লুকোচুরি, ফুলটোকা আরো কত কি! তবে আশার কথা হচ্ছে, ৫০টি দেশীয় খেলা তালিকাভুক্ত করে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) বিল ২০১৯' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে। এতে করে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলো আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসবে।

ছোট্ট সোনামনিরা, তোমরা কিন্তু ভালোভাবে পড়বে আমাদের এ সংখ্যাটি আর খেলবে। কেমন হলো জানাবে কিন্তু!

আশা করি, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। অবশ্যই নবারুণের সাথেই থাকবে। ■

সূচি

নিবন্ধ

৬ প্রাচীন যুগে খেলাধুলা/ড. মোহাম্মদ হাননান
১১ ক্রীড়াপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও পরিবার/নাসরীন মুস্তাফা
২৪ শৈশবের খেলাধুলা/শরিফুজ্জামান পিন্টু
৩৬ খেলাধুলার গুরুত্ব/মো. রেজুয়ান খান
৩৮ ছড়াই গ্রামীণ খেলার প্রাণ/শাহ্‌রিয়ার শরিফ
৪৯ ছন্দের খেলা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫২ জাতীয় খেলা হাডুডু/মেজবাউল হক
৫৮ উৎসবের খেলা/মো. জামাল উদ্দিন
৬০ জনপ্রিয় খেলা/মো. ইকবাল হোসেন
৭০ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খেলা/শাহানা আফরোজ
৭৪ অবসরের খেলা/কামরুল হাসান
৭৫ মেয়েদের গ্রামীণ খেলা/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৭৬ আরো কিছু খেলা/ফারহানা মুকসিত
৭৭ খেলায় বাংলাদেশের রেকর্ড/রাকিব হাসান
৭৯ মজার খেলা/হাফিজুর রহমান
৮০ করোনা প্রতিরোধে কিশোরীর আবিষ্কার/জান্নাতে রোজী

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে

৩ শোকগাথা ৩রা নভেম্বর/খালেক বিন জয়েনউদদীন

অ্যালবাম

২২ খেলাধুলা প্রিয় প্রধানমন্ত্রী

ভাষা দাদু

৬৭ খেলার উচ্চারণ খ্যালা কেন?/তারিক মনজুর

গল্প

৫৪ মাছি খেলছে কানামাছি/খায়রুল বাবুই
৬২ রুমাল গেল কই?/আহমেদ রিয়াজ
৬৪ তিলু জোকার/ফারহিম ভীনা

কবিতা

২৩ কুররাতুল আইন সানজিদা
৫০ সৈয়দ মাশহুদুল হক
৫১ মো. মুশফিকুল ইসলাম মিদুল/ তৌসিফ আলম তুহিন
৫৭ আদনান শাহরিয়ার/সালাম ফারুক
৬৯ রানাকুমার সিংহ/ নুসরাত জাহান
৭৮ মো. কামরুজ্জামান/শাহজাহান মোহাম্মদ
৮০ মো. আবু বকর

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আব্দুর রাআদ নাফিউ, মাসরুর সাফির
শেষ প্রচ্ছদ : রাফান ইবনে মেহেদী
৪ আদ্রিতা খানম নিথর
৩৭ ইরিনা হক
৫৩ মো. তাসকিন আহমেদ হামিম
৬৬ রেজওয়ান আল রাহাত
৭৩ কাশফিয়া আক্তার

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

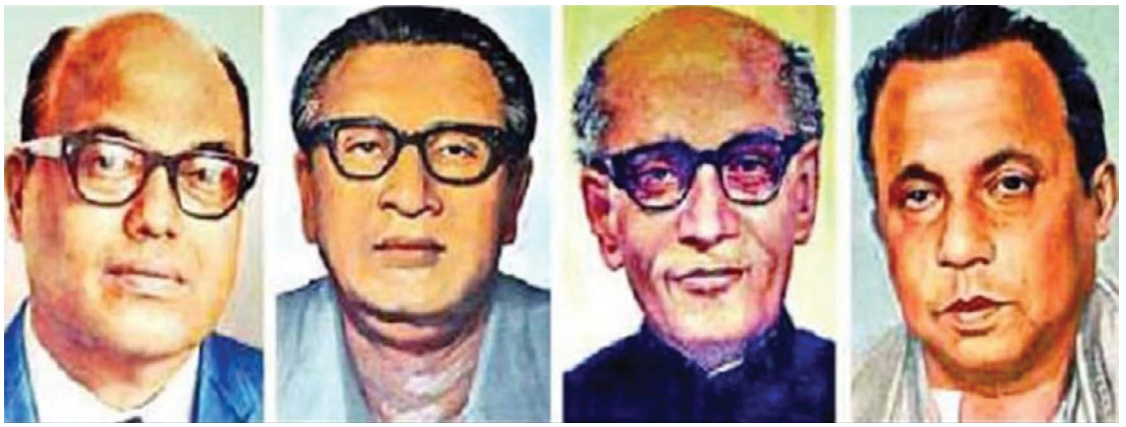

শোকগাথা ৩রা নভেম্বর

খালেক বিন জয়েনউদদীন

'জেল' শব্দটির সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। এটি ইংরেজি ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো কারাগার, কারাগৃহ ও কয়েদখানা। কারাগারে সাধারণত কয়েদিদের বন্দি করে রাখা হয়। আমরা বলি জেলখানা, কারাগার কিংবা কারাগৃহ।

কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুবার জেল খেটেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তাঁর সাড়া জাগানো আত্মকথা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এই কারাগারে বসেই লেখা। এই জেলখানার আর একটি শোকাবহ ঘটনা হলো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক ও বঙ্গবন্ধুর সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে এই কারাগারে রেখে কোনো মামলা অপরাধ ছাড়াই নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর এ ঘটনা ঘটে। আমরা প্রতি বছর তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং দিনটিকে জেলহত্যা দিবস হিসেবে পালন করি।

বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম ও আন্দোলন করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাঁর সহকর্মী ও স্বাধীনতাকামী মানুষের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা এনে দেন। পাকিস্তানিদের সাথে নয় মাসের যুদ্ধে মিত্রশক্তি ভারতের সহযোগিতায় বিজয় অর্জন করি আমরা। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো।

জেলখানায় ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, তার প্রকৃত চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় বিচারাধীন জেল হত্যা মামলার চার্জশিটে। এই চার্জশিটটি ১৯৯৮ সালের ১৬ই অক্টোবর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চার্জশিটের বিবরণে বলা হয় :

> ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর রাত ৪ টা থেকে ৫টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। এ সময় হত্যাকারীরা দু'বার কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে চার নেতাকে। ১৯৭৫ সালের ২রা নভেম্বর রাত পৌনে ২টার সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জলপাই রঙের একটি জিপ এসে থামে। জিপ থেকে নেমে আসে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র চার সদস্য। এদের একজন রিসালদার মোসলেম। তারা জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নিয়ে যেতে চায়। ডিআইজি প্রিজন কাজী আবদুল আওয়াল এতে খুব ভয় পেয়ে যান। তিনি এটা জেল কোডের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রিসালদার মোসলেম নাছোড়াবান্দা। তিনি বঙ্গভবনে ফোন করেন। এবার কারাগারে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যায় চার ঘাতক। তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন নিউ জেলের (কেন্দ্রীয় কারাগার-এর) ১ নম্বর সেলে। পরবর্তী সেলে ছিলেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। তাদের সবাইকে জড়ো করা হয় তাজউদ্দীনের সেলে।

এরপর খুব কাছ থেকে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। তাজউদ্দীনের পেটে ও হাঁটুতে গুলি লাগে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেও তিনি দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকেন। তারা কারাগারে প্রবেশ করে রাত ৪টায় আর বের হয় ৫টা ৩৪ মিনিটে। নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে যায় ঘাতক দল। মধ্যরাতে কারা অভ্যন্তরে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটলেও বাইরের পৃথিবীর কেউ তা জানত না। এমনকি সেলের মধ্যেই সকাল ১০টা পর্যন্ত লাশগুলো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। সকাল ১০টার পর কেন্দ্রীয় কারাগারের চিকিৎসকরা সেলে প্রবেশ করে। সেলের মধ্যেই লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন। প্রকৃতির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। সময় ও ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ঘাতক দল বিনাশ হয়েছে বিধাতার বিচারে। বাংলার মানুষ একদিন অঝোরে কেঁদেছিল। প্রকৃতির বিচারে দেশ ও জাতি কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

আজ আমরা জোর গলায় বলতে পারি- বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর এই সংগ্রাম আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বটি নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মাতৃভূমির স্বাধীনতা। বাঙালির ইতিহাসে তাদের কীর্তিগাথা চিরকাল জ্বলজ্বল করবে।

তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে সেই ১৯৭৫ সালে স্থানীয় লালবাগ থানায় জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উল্লেখ করে একটি ডাইরি করা হয়েছিল। কিন্তু ডাইরির আলোকে কোনো তদন্ত হয়নি। ১৯৯৬ -এর ২৩শে জুন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে হত্যার বিচার শুরু করল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারও প্রায় শেষ হয়েছে।

হ্যাঁ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের যে কক্ষটিতে হত্যা করা হয় সেই কক্ষটিকে কারাস্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এটি ২০১০ সালে উদ্‌বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ■

আদ্রিতা খানম নিথর, ১ম শ্রেণি, বোয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলো

'শৈশব' শব্দটা শুনলেই কেমন যেন একটা ধূসর গল্পের জগৎ সামনে চলে আসে। নির্ভার, চিন্তাহীন একটা সময়। কত কী-না করেছি আমরা সে সময়! কত গল্প, কত দুষ্টুমি আর কত খেলা। হারানো ধুলোমাখা দিন, বুকের ভেতর আজও রঙিন শৈশব ডাকে শুধু আয়, আয়, আয়। নাগরিক কোলাহল আর সময়ের প্রয়োজনে শৈশব যেন হারিয়ে গেছে। দুরন্তপনা শৈশবের সঙ্গে আজ হারাতে বসেছে আবহমান গ্রামবাংলার প্রিয় খেলাগুলো।

এক সময় শিশুরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করে সময় কাটাত। পুরো শৈশব জুড়েই থাকত দুরন্তপনা। শৈশবের দুরন্তপনা হলো শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যম। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিলীন হতে বসেছে সব। ইউটিউব আর ভিডিও গেমসে আটকে যাচ্ছে শৈশব। শিশুবিদরা বলেছেন, গ্রামবাংলার খেলাধুলা যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে হারাচ্ছে শিশুদের মেধাবিকাশের উপকরণ।

খেলা আমাদের আদি ক্রীড়া সংস্কৃতি। কুতকুত, দড়িলাফ, কাবাডি, কানামাছি, চিনিবিস্কুট, লুকোচুরি, গাদি, নুনধাপসা আরো কত নাম জানা, না জানা খেলার প্রচলন ছিল। আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এসব খেলাধুলা। নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন শুধুই গল্প।

এরই মাঝে আশার আলো দেখাচ্ছে সরকার। ৫০টি দেশীয় খেলা তালিকাভুক্ত করে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) বিল– ২০১৯' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ২০১৯ সালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান বিলটি পাসের প্রস্তাব করেন। বিলের ওপর দেওয়া জনমত, যাচাই-বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি শেষে ২৮শে জানুয়ারি ২০২০ সংসদে কণ্ঠভোটে বিলটি পাস হয়। বিলটি ১২ই ফেব্রুয়ারি- ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে। [ধারা ২(১) ও ৫(৬)]

১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করতে বিলটি আনা হয়েছে। বিলের তফসিলে ৫০টি দেশীয় খেলা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হলো– *হাডুডু, ডাংগুলি, গোল্লাছুট, সাতচাড়া, মোরগ লড়াই, বৌচি, ইচিংবিচিং, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, দাঁড়িয়াবান্ধা, এক্কাদোক্কা, কুতকুত, রুমাল লুকানো, ওপেনটি বায়োস্কোপ, ফুল টুকা, দড়িলাফ, বিস্কুটদৌড়, সুঁইসুতা দৌড়, তৈলাক্ত বাঁশে ওঠা, কলাগাছে ওঠা, লাঠিখেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, বালিশযুদ্ধ, রশি টানাটানি, ষাঁড়ের লড়াই, গরুর গাড়ির দৌড়, ঘোড়দৌড়, বস্তাদৌড়, বালিশ বদল, বলীখেলা, লুডু, পাঞ্জা লড়াই, লাটিম খেলা, গুলতি ছোড়া, ভেলাবাইচ/নৌকাবাইচ, ঘুঁটি খেলা, তীর-ধনুক খেলা, চাকা দৌড়ানো, মার্বেল খেলা, কড়ি খেলা, হাঁড়িভাঙা, হাঁস খেলা ও ব্যাঙদৌড়, চেয়ার বদল, হাইজাম্প, লং জাম্প, পতাকা দৌড়, সাঁতার প্রতিযোগিতা, দাবা খেলা, বর্শা নিক্ষেপ, কেরাম বোর্ড খেলা।*

ছোট্ট বন্ধুরা, এই ৫০টি খেলা আর আমাদের শৈশবের সেইসব গল্পগাথা হারানো খেলা নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের নবারুণ। এসো হারিয়ে যাই ধুলোমাখা সেসব খেলায়। ■

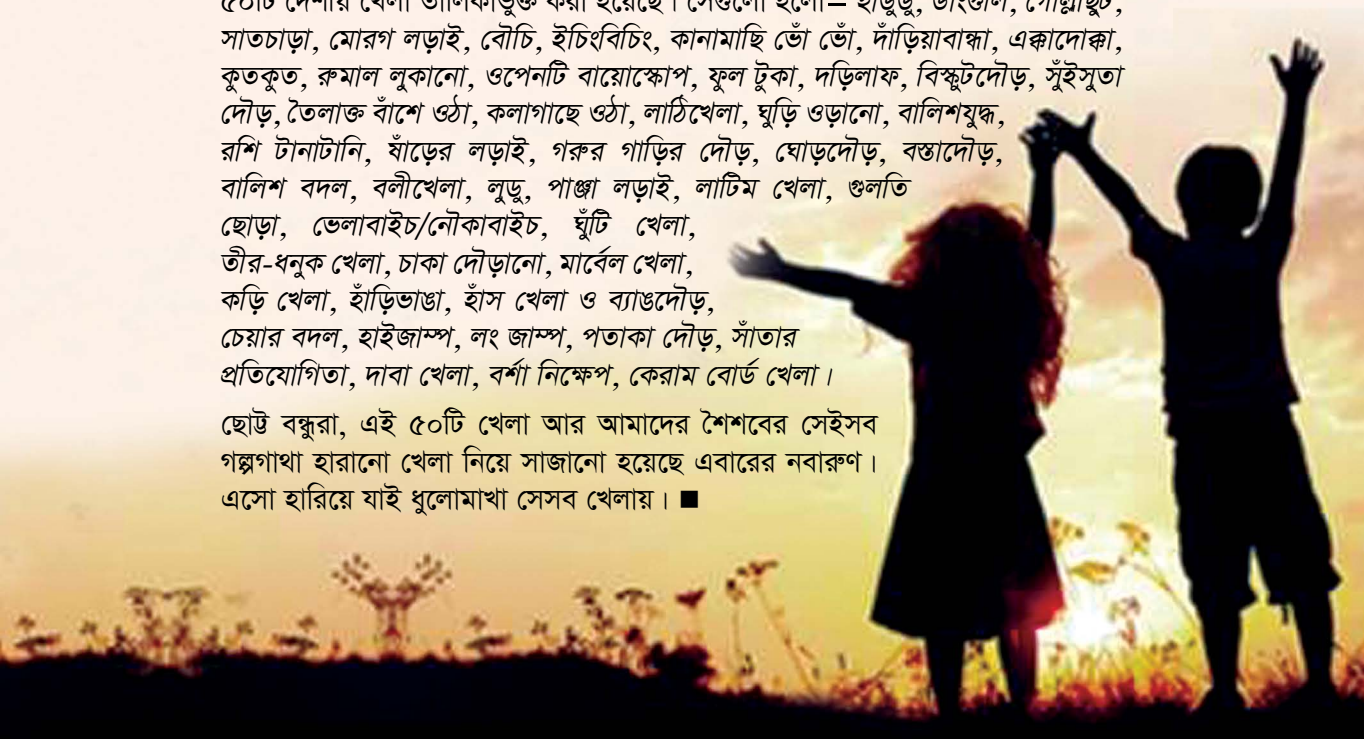

নিবন্ধ

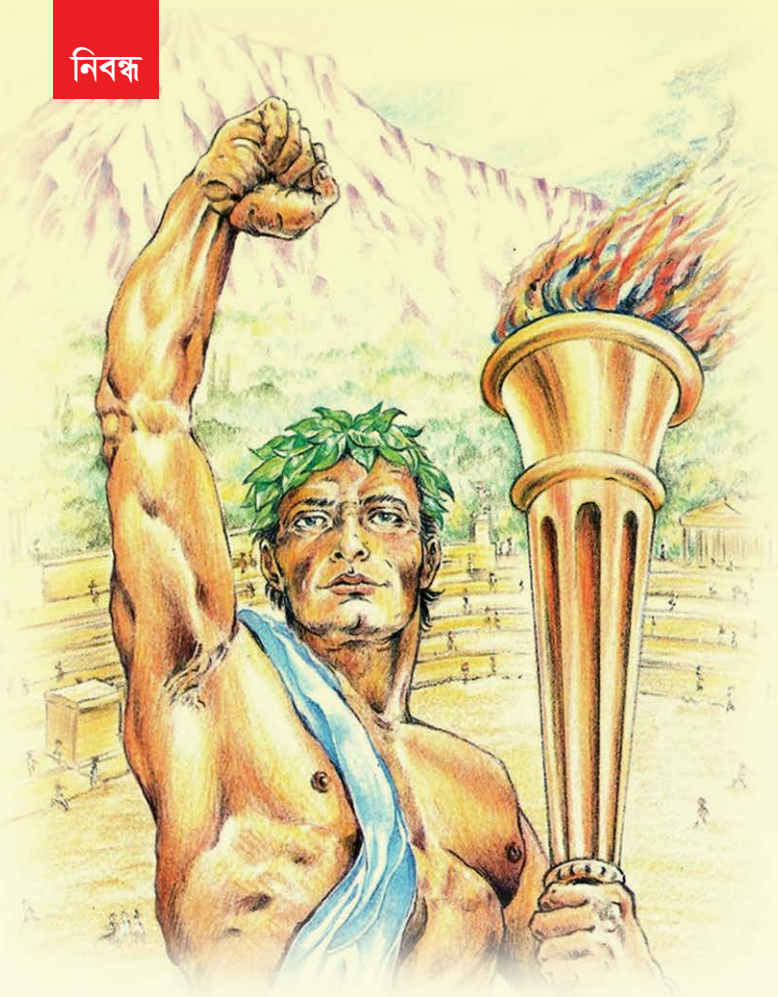

প্রাচীন যুগে খেলাধুলা

ড. মোহাম্মদ হাননান

প্রাচীন বৈদিক ধর্মে (অনেকে এটাকে হিন্দু ধর্ম বলে থাকে) নানা বিষয়ের দেবতা আছে। এদের সংখ্যা কমবেশি তেত্রিশ কোটি। কিন্তু এত দেবতার মাঝেও খেলা ডিপার্টমেন্টের জন্য কোনো দেবতা নেই। এতে বোঝা যায়, প্রাচীন যুগে ধর্মে খেলা গুরুত্ব পায়নি। এ বৈদিক ধর্মের বয়স কম করে হলেও তিন হাজার বছরের প্রাচীন।

আবার দেড় হাজার বছরের প্রাচীন ইসলাম ধর্মের নবি মোহাম্মদ (সা.) -এর জীবন -ঘটনায় খেলাধুলার কয়েকটি কাহিনি পাই। যেমন, নবি (সা.) -এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) একদিন 'মল্লযুদ্ধ' খেলা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। তাই নবী (সা.) তাঁকে পর্দার আড়াল করে মল্লযুদ্ধ খেলার মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা আমি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। সেখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.) আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে ইচ্ছা করে হেরে যান। কিছুদিন পর পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আমি হেরে যাই। অতঃপর হজরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, হে আয়েশা! আজ আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে পারোনি। এটা প্রথম প্রতিযোগিতায় তুমি জিতে যাওয়ার বদলা। আবার হযরত মোহাম্মদ (সা.) -এর নাতি হোসেন (রা.) -এর শৈশবে 'ঘোড়া-ঘোড়া' খেলার জন্য নবি (সা.)

উপুড় হয়ে ঘোড়া হয়েছিলেন এবং হোসেন (রা.) নবি (সা.) –এর পিঠে চড়ে বেড়িয়েছেন। এখানে দেড় হাজার বছর আগের তিনটি খেলার বিবরণ আমরা পেলাম, যার একটি বড়োদের মল্লযুদ্ধ, দ্বিতীয়টি দৌড় প্রতিযোগিতা, অন্যটি ছোটোদের ঘোড়া-ঘোড়া খেলা। বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে যে প্রাচীন ফলক পাওয়া গেছে, তাতে মল্লযুদ্ধের এবং কুস্তির অনেক ছবি রয়েছে। এতে বোঝা যায়, মল্লযুদ্ধ যা বাংলাদেশে কুস্তি বলে পরিচিত, তা ছিল আমাদের প্রাচীনকাল থেকেই।

বিশ্বে খেলাধুলার বাস্তব ইতিহাস আরো প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ৭৭৬ (অর্থাৎ যিশু খ্রিষ্টের জন্মেরও ৭৭৬ বছর পূর্ব) থেকে দুনিয়ায় নানারকম খেলাধুলার প্রচলন ছিল। কিন্তু বিশ্ব অলিম্পিকের 'ম্যারাথন' খেলাটির ইতিহাস আরো বেশি প্রাচীন। ম্যারাথন আসলো কোথা থেকে! এটা খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের একটি কাহিনি। তখন পার্শিয়ানদের সঙ্গে গ্রিস দেশের যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধে গ্রিসরা জয়লাভ করে। এক সৈন্যের কাছ থেকে শুনে ফিলিপপাইডিস (Philppidis) নামে এক লোক আনন্দে খবরটি পৌঁছে দিতে ম্যারাথন নামক জায়গা থেকে দৌড় দিয়ে রাজধানী এথেন্সে পৌঁছাল। পথে সে একটুও যাত্রাবিরতি করেনি 'আর এথেন্সে পৌঁছে সে উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি দিতে থাকে' আর এমন একটা অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে। ফিলিপপাইডিস যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তার পরিমাপ ম্যারাথন থেকে এথেন্স ছিল ৪০ কিলোমিটার (অথবা ২৫ মাইল)। এ ঘটনা স্মরণে রাখতে ১৮৯৬ সালের প্রথম অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড় অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ১৯০৮ সালে যখন লন্ডনে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়, তখন রানি আলেকজান্দ্রা বললেন, ম্যারাথন হবে 'লন অব দ্য উইন্ডমেরি ক্যাসেল' থেকে রয়েল বক্স স্টেডিয়াম পর্যন্ত, যাতে রাজপরিবারের সদস্যরা ম্যারাথনটা ভালোভাবে উপভোগ করতে পারে। এর দূরত্ব ছিল ২৬.২ মাইল। সে থেকে অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়টা হয় ২৬.২ মাইল দূরত্ব অতিক্রমের।

বাঙালিদের অনেক বড়ো লেখক ও গবেষক নীহাররঞ্জন

রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বাঙালি নারীদের প্রাচীন খেলা হিসেবে সাঁতার কাটা ও বাগান তৈরির কথা উল্লেখ করেছেন। বাগান তৈরি করা কেমন করে খেলা হলো, সে প্রশ্নে নাইবা গেলাম, তবে বিয়ের উৎসবে পাশা খেলা থাকতেই হতো।

আরো ছিল দাবা খেলা। খেলার নাম পরিচয় দেখে মনে হয় এটা ইউরোপের খেলা, পরে বাংলা মুলুকে এসেছে– মোটেই তা নয়। হাজার বছর আগে থেকেই বাঙালিরা দাবা খেলে আসছে, তবে দাবা খেলায় সময় লাগে অনেক, সাধারণ মানুষের এত সময় নাই, তাই দাবাটা চলে গেল রাজা-বাদশাহদের ঘরে।

বাঙালির প্রাচীন কাব্য *চর্যাপদ*-এ প্রাচীন কবি কাহ্নপাদ তাঁর কবিতায় দাবা খেলার কথা এবং তাঁর গুটির নামসহ চাল দেওয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন:

করুণা পিঁহাড়ি খেলহু নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তেড়িয়া বড়িয়া মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িয়া পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিয়া ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্ন অমহে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোয়া গুনিয়া লেহু॥

উপরের কবিতাটি পড়তে এবং শুনতে তোমাদের কাছে যত খটমটই লাগুক, এটা হলো আমাদের প্রাচীন বাংলা ভাষা। প্রাচীনকালে বাঙালিরা এভাবেই কথা বলত, এর নাম চর্যাপদ।

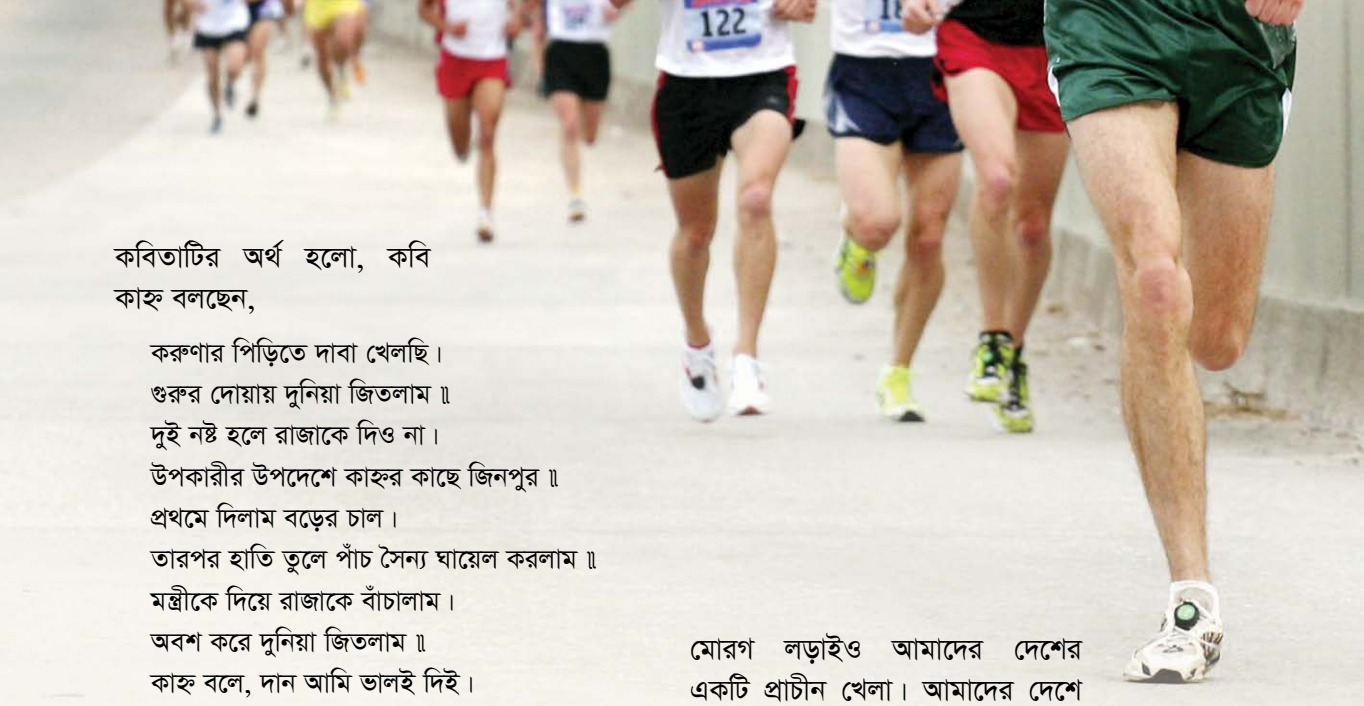

কবিতাটির অর্থ হলো, কবি কাহ্ন বলছেন,

করুণার পিড়িতে দাবা খেলছি।
গুরুর দোয়ায় দুনিয়া জিতলাম ॥
দুই নষ্ট হলে রাজাকে দিও না।
উপকারীর উপদেশে কাহ্নর কাছে জিনপুর ॥
প্রথমে দিলাম বড়ের চাল।
তারপর হাতি তুলে পাঁচ সৈন্য ঘায়েল করলাম ॥
মন্ত্রীকে দিয়ে রাজাকে বাঁচালাম।
অবশ করে দুনিয়া জিতলাম ॥
কাহ্ন বলে, দান আমি ভালই দিই।
চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই ॥

এ কবিতার মর্মার্থ (ভেতরের অর্থ) যা-ই থাকুক, এটা একটা নিখাদ দাবা খেলার কাহিনি, হাজার বছরের আগের এক বাঙালি কবি লিখে গেছেন। তাই বাংলার প্রাচীন খেলার মধ্যে দাবা অগ্রগণ্য।

মেয়েদের খেলার কথাও বলছিলাম। মেয়েরা সেই প্রাচীন আমলে আর কী কী খেলত। 'কড়ি' কথাটা তোমরা শুনেছ বোধহয়, যেমন 'টাকা-কড়ি'। 'কড়ি' নিজেই ছিল এক প্রকার টাকাপয়সা। আগের দিনে কড়ি দিয়ে বেচাকেনা হতো। এ কড়ি দিয়ে মেয়েরা ঘরে নানা প্রকার খেলা করত। অল্পবয়সি ছেলেরাও আগে কড়ি খেলত। আমাদের শৈশবে (আমাদের শৈশবটা ছিল পাকিস্তান আমলে) আমরাও কড়ি দিয়ে নানা খেলা খেলেছি। এর মধ্যে একটি ছিল 'আছে-নাই' খেলা। এক হাতে এক-দুটি কড়ি নিয়ে প্রতিপক্ষকে বলা হতো, 'বলো, কোন হাতে কড়ি কোন হাতে নাই'? এই আছে, এই নাই–অনেকটা 'ভোজের বাজি'র–মতো খেলা।

আরেকটি খেলা ছিল গুটি খেলা। ষোলো ঘর নয় ঘর খেলাও ছিল। ষোলোটি বা নয়টি ঘর করে পরস্পর গুটি চালাচালি করে এ খেলা খেলত। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, এ গুটি খেলা শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রচলিত ছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতেও।

মোরগ লড়াইও আমাদের দেশের একটি প্রাচীন খেলা। আমাদের দেশে এখনও হাটে-বাজারে দুই জঙ্গি-মোরগের লড়াই-এর খেলা দেখিয়ে একদল পয়সা কামাই করে। অনেক দেশে মুরগির পায়ে ছুরি লাগিয়ে দেওয়া হয় রক্তাক্ত করার জন্য। স্পেনে এমন লড়াই হয়, ষাঁড়ের লড়াইয়ের নামে। প্রাচীন এ ষাঁড়ের লড়াই এখনও প্রতি বছর স্পেনে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বছরই খেলা দেখতে আসা মানুষ কেউ না কেউ মারা যায়।

ঘোড়ার দৌড় আছে প্রাচীন আমল থেকেই, অনেক দেশে এখনও এটা জনপ্রিয় খেলা। ব্রিটিশ আমলে ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঘোড়দৌড় খেলা হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ খেলা বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেন। কারণ এর অনেক খারাপ দিক ছিল ফলে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এখন আর 'ঘোড়দৌড়' হয় না। ব্রিটেনের রাজপরিবারের সদস্যরা ঘোড়দৌড় খেলায় এখনও লন্ডনে 'বাজিমাত' করে চলে।

বাজিখেলাও একটি খেলা। তবে টাকাপয়সা, সম্পদের বিনিময়ে বাজি ধরা খুবই গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয়। এ খেলার আরেক নাম 'জুয়া খেলা'। সমাজের খারাপ লোকেরাই এগুলো খেলে থাকে। প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তা এখনও সমাজে আছে। এখন দেখবে ক্রিকেট খেলা নিয়ে অনেক দুষ্টু লোকেরা বাজি ধরে থাকে এবং এ নিয়ে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়।

তীর-ধনুকের খেলাও খুব জনপ্রিয় ছিল। লক্ষ্যভেদ করার মধ্যে আনন্দ যেমন ছিল, তেমনি এ নিয়ে হতো চরম রেষারেষিও। যুদ্ধবাজরা প্রধানভাবে এগুলো খেলত। এ খেলার মূল উৎস প্রাচীন আমল। উদ্দেশ্য ছিল পশুশিকার করা।

বাংলাদেশ পানির দেশ বলে সাঁতার কাটার খেলাটিও প্রাচীনকাল থেকে এখানে জনপ্রিয়। বাঙালি সাঁতারু ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছেন।

নৌকাবাইচও একটি প্রাচীন খেলা। এ খেলা গ্রামে-গঞ্জে প্রধানভাবে বর্ষাকালে হতো। নদী তীরবর্তী এলাকায় 'নৌকাবাইচ' হয় সারা বছরই বিভিন্ন জাতীয় দিবস ধরে।

প্রাচীন দুনিয়ার আরেকটি খেলা ছিল লাঠিখেলা। এটা এত প্রাচীন যে তখনও মানুষ অস্ত্রশস্ত্র বানাতে শেখেনি। লাঠিই ছিল তখন প্রধান অস্ত্র— আক্রমণ করতে অথবা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, লাঠিই ছিল প্রধান ভরসা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে লাঠিখেলার উৎসব এখনো খুব জমে উঠে। এতে বোঝা যায় লাঠি খেলা ছিল বাংলার প্রাচীন মানুষেরও খেলা। লাঠি থেকে 'লাঠিয়াল' কথাটির উৎপত্তি। 'লাঠিয়াল' মানে লাঠিওয়ালা। পরে এ লাঠিওয়ালারা লাঠি দ্বারা শাসন করতে চাইত বলে 'লাঠিয়াল' অত্যাচারীর প্রতীক হিসেবেও সমাজে পরিচিত হয়ে উঠে।

তথ্যসূত্র :

১. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

২. দীনেশ চন্দ্র সেন: *বৃহৎবঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

৩. মোহাম্মদ হাননান: বাঙালির ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ২০১২

৪. Child craft: *Exploring the past*, world book international, Volume 13, London, 1996.

৫. Elizabeth Nix: *Why is a marathon 26.2 Miles*, History Tv Channel Blog.

৬. Wikipedia. ■

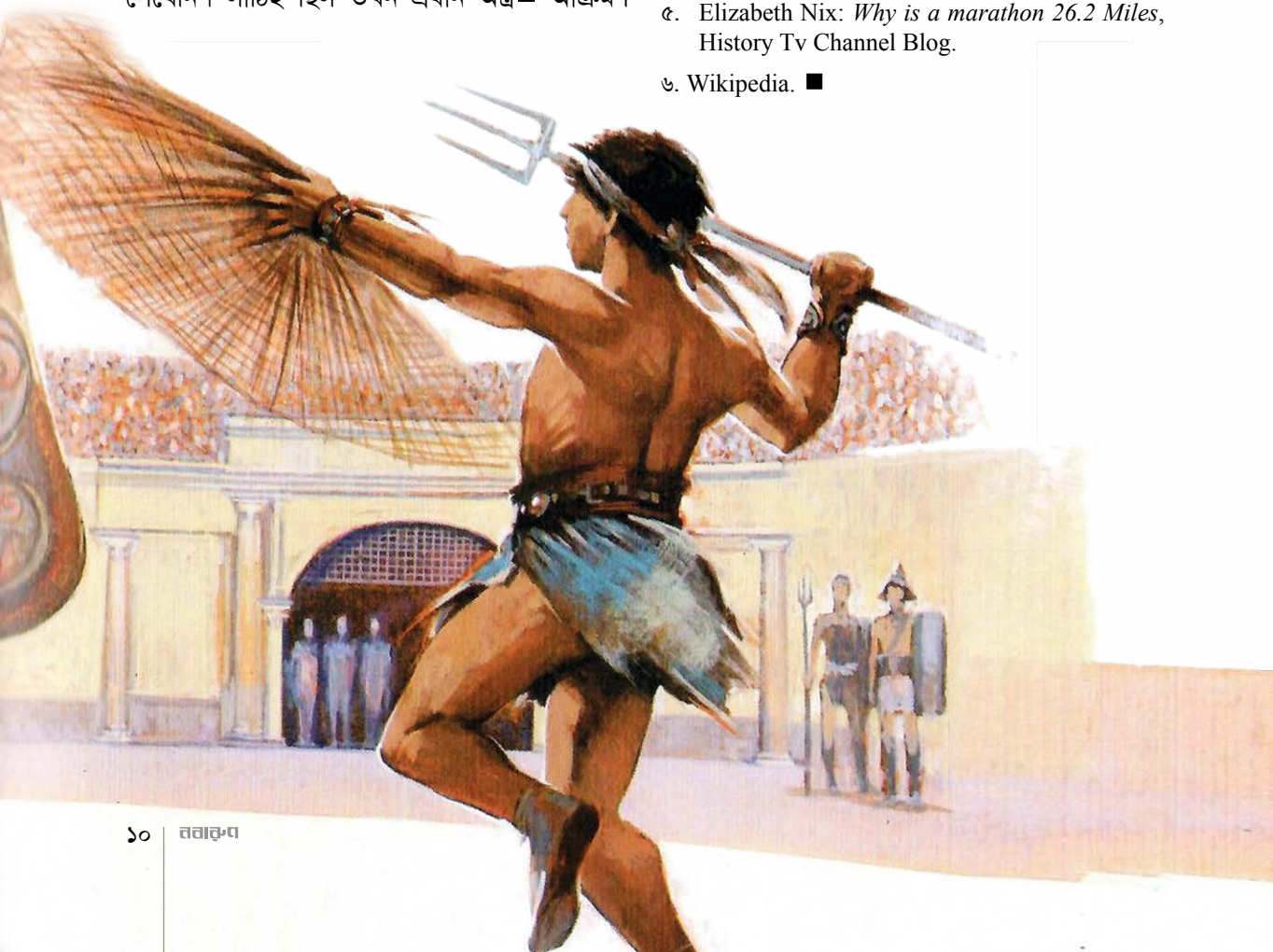

ক্রীড়াপ্রেমী বঙ্গবন্ধু ও পরিবার

নাসরীন মুস্তাফা

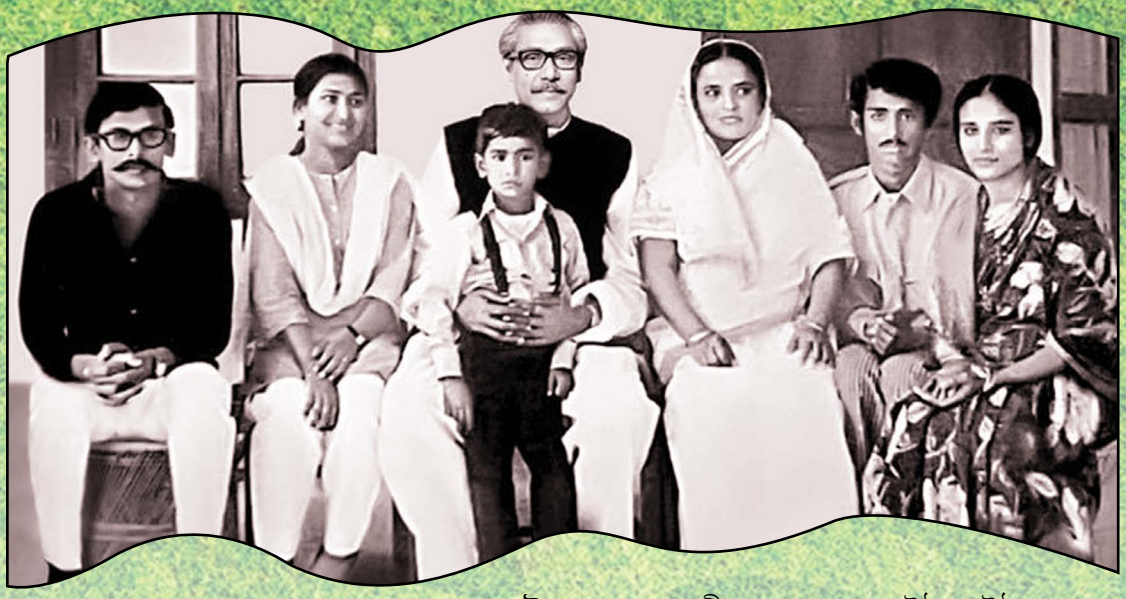

বাংলাদেশের আর সব গ্রামের মতোই টুঙ্গিপাড়া গ্রামটিও দারুণ সবুজ। গাছের সবুজ, পুকুরের গভীর পানিতেও সবুজের ছায়া। রোদ আর মেঘের খেলায় সাদা আর নীলের মনেও উঁকি দিয়ে যায় সবুজ সবুজ ভালোবাসা।

এ রকম সবুজের মাঝে জন্ম নেওয়া 'খোকা' সবুজ মন নিয়ে বড়ো হয়ে উঠবেন, এতে আসলে অবাক হয়ে ওঠার কিছু নেই। গ্রামের শিশু-কিশোরের মতোই গাছের উঁচু ডাল থেকে পুকুরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া খোকার প্রিয় কাজ হবে, তাতেও অবাক হই না। বাতাবি লেবুকে ফুটবল বানিয়ে শিশুদের সাথে খেলতে খেলতে বড়ো হলেন, এও কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

এই খোকা তাহলে অবাক করা কোন ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁকে নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলছি সবাই? এই প্রশ্নের উত্তর তুমিও জানো। খুব সহজ জীবনে বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে খোকা আসলে আর সবার মতো কেবল দেখে যাননি। তিনি ভেবেছেন। সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার, মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এর জন্য তিনি সাহস করে সামনে থেকে প্রতিবাদ করেছেন। পিছিয়ে পড়েননি কখনো। বছরের পর বছর তাঁকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে, তবুও তিনি মনোবল হারাননি। এই লড়াকু মনোভাব খোকাকে বানিয়েছিল সব মানুষের নেতা। তিনিও সব মানুষকে নিজের মানুষ হিসেবে আগলে রাখতে চাইতেন। এমন ব্যবহার করতেন, মনে হতো সবাই তার আপনজন।

তুমি জানো এই খোকার পুরো নাম কি? শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির বন্ধু, বঙ্গের বন্ধু বলে মানুষ ভালোবেসে তাঁর নাম দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষকে প্রতিবাদী করে গড়ে তুলে তিনি সবাইকে একসাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়ার মতো সাহসী করে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লড়াকু মনোভাব, নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ কীভাবে পেলেন, এ নিয়ে গবেষণা চলছে বিস্তর। তাঁর বেড়ে ওঠার সময়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। অনেকেই বলছেন, বঙ্গবন্ধু ছোটোবেলা থেকেই খেলার মাঠে নেতৃত্ব দিতে ভালোবাসতেন, এই মনোভাব তাঁকে বড়ো হওয়ার পরও সাহায্য করেছে। 'খেলোয়াড়ি মনোভাব' বা 'Sporty Attitude' বলে একটি কথা আছে। খেলার মাঠে জয়ের জন্য মন প্রাণ দিয়ে লড়তে হয়, মাঠের বাইরে জয়-পরাজয় নিয়ে ভাবতে হয় না, প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কেও বন্ধুর মতো গ্রহণ করতে হয়, প্রতিহিংসার ইচ্ছে মনে রাখতে হয় না- এ রকম নানা বিষয় জড়িয়ে আছে খেলোয়াড়ি মনোভাবের সাথে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য হার না মানা লড়াই করেছেন। এমন একটা সময় ছিল, তাঁর তর্জনীর আদেশে চলত বাঙালির প্রতিজন। কিন্তু নেতা বঙ্গবন্ধু কখনোই প্রতিহিংসার ভাষা ব্যবহার করেননি, সহিংস হয়ে উঠতে প্রশ্রয় দেননি। প্রতিরোধ করতে বলেছেন, দাবি আদায়ে একাট্টা হতে বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর জোর দিয়েছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা পেয়েছিল বাঙালিরা। পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা ভোটের ফলাফল না মেনে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসতে চায়। বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসেছেন, একই সাথে সবাইকে প্রস্তুত করেছেন যদি আঘাত আসে তা প্রতিহত করার জন্য। আর তাই পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি এ দেশের মানুষের উপর চরম নির্যাতন চালালে তিনি বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'। মানুষ তা-ই করল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকা শিশু-নারী-পুরুষের বুকে গুলি চালালো পাকিস্তানের পুলিশ। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বললেন, বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। মানুষ তা-ই করল। দীর্ঘ নয় মাস তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয় অর্জিত হলো। জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ।

খেলোয়াড়ি মনোভাবের বঙ্গবন্ধু গড়ে উঠেছিলেন কি খেলোয়াড় বঙ্গবন্ধুর কারণে? যারা খেলাধুলা করে, তাদের মাঝে এ রকম মনোভাব গড়ে ওঠে বলেই বঙ্গবন্ধুকে এভাবে বিশ্লেষণ করতে চাইছেন গবেষকরা। জানতে চাইছেন বঙ্গবন্ধুর খেলোয়াড়ি জীবনের ঘটনা, খেলাধুলা নিয়ে তাঁর উৎসাহের কথা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটা ভালোভাবে জানি, তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন সম্বন্ধে বেশি আলোচনা হয়নি, যা হওয়া প্রয়োজন। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি আমরা। এ সময় খেলার জগতের বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারে খেলার চর্চা নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেরা শিখতে চাই, কীভাবে বঙ্গবন্ধুর মতো অসাধারণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি আমরা।

খেলোয়াড় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভালো খেলোয়াড়। ছোটোবেলায় নিজের স্কুলের ফুটবল দলে অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি। চাইলে নামকরা ফুটবলার হতে পারতেন। হাডুডু, ভলিবল, হকিও খেলতে ভালোবাসতেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লেখা বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তেই লিখেছেন, 'ছোটো সময়ে আমি খুব দুষ্টু প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভালো ব্রতচারী করতে পারতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না। তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে (আমার) ভাল অবস্থান ছিল।'

খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা তিনি শিখেছিলেন পরিবার থেকেই। বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন ফুটবলার। পেশায় তিনি গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। গোপালগঞ্জের প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টগুলোতে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন বাবা। গোপালগঞ্জ অফিসার্স ক্লাব দলটির অধিনায়ক ছিলেন। অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারির দায়িত্বও পালন করেছেন বাবা শেখ লুৎফর রহমান।

আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টের ট্রফিসহ অধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ফুটবল টিমের মাধ্যমে কিশোরদের ফুটবল খেলায় উৎসাহী করতে চাইতেন তিনি। আর তাই ভালো খেলোয়াড়দের মিশন স্কুলে বিনা পয়সায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতেন।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হলো খোকাকে। ভালো ফুটবল খেলেন বলে মিশন স্কুলের ফুটবল অধিনায়ক হলেন। অধিনায়ক হিসেবে নিজের দলে ভালো খেলোয়াড় ঢোকাতে স্কুলে বিনা পয়সায় ছাত্রদের ভর্তি করার ব্যাপারে খুব সোচ্চার ছিলেন।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন-'খেলাধুলার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল। আব্বা আমাকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না। কারণ আমার হার্টের ব্যারাম হয়েছিল। আমার আব্বাও ভালো খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। আর আমি মিশন স্কুলের ক্যাপটেন ছিলাম। আব্বার টিম ও আমার টিমের যখন খেলা হতো তখন জনসাধারণ খুব উপভোগ করত। আমাদের স্কুল টিম খুব ভালো ছিল। মহকুমায় যারা ভালো খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।'

মিশন স্কুলের ফুটবল দল অফিসার্স ক্লাবের বিপক্ষে খেলেছে বেশ কয়েকবার। বুঝতেই পারছ, বাবা আর ছেলে মুখোমুখি। খেলার মাঠে এই বাবা-ছেলের প্রতিযোগিতা দেখার জন্য সবার মাঝে দারুণ উৎসাহ থাকত। কে জিতবে? বাবার দল না ছেলের দল?

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি আরো লিখেছেন, 'অফিসার্স ক্লাবের টাকার অভাব ছিল না। খেলোয়াড়দের বাইরে থেকে আনত। সবাই নামকরা খেলোয়াড়। বৎসরের শেষ খেলায় আব্বার টিমের সাথে আমার টিমের পাঁচ দিন ড্র হয়। আমরা তো ছাত্র; এগারোজনই রোজ খেলতাম, আর অফিসার্স ক্লাব নতুন নতুন প্লেয়ার আনত।'

ফুটবলার হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল মুজিবের। নানা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের জন্য খেলতে যেতেন বিভিন্ন শিল্ড টুর্নামেন্টে। জয় করে আনতেন শিরোপা। এ রকম এক শিরোপা হাতে বসে আছেন কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান, সেই ছবি আমাদের খুব চেনা। 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : আলোকচিত্রের অ্যালবাম' বইটিতে গোপালগঞ্জ আন্তঃস্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ী দলের খেলোয়াড়দের ট্রফিসহ ছবি এটি। আন্তঃস্কুল টুর্নামেন্টের ট্রফি নিয়েই সামনের সারিতে বসেছিলেন মিশন স্কুলের অধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। তার ঠিক পাশে ছিলেন গোলরক্ষক বতু মিয়া। বঙ্গবন্ধুর অঙ্কের শিক্ষক মনোরঞ্জন অধিকারী ছিলেন দলের সাথে ছবি তোলার সময়। ফাইনাল খেলায় রেফারির বাঁশি বাজিয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ। সেই ঐতিহাসিক ট্রফিটার খোঁজ নেই, কেউ জানে না এটা কীভাবে কখন হারিয়ে গেছে।

গোপালগঞ্জে যাওয়ার আগে টুঙ্গিপাড়াতে খোকা কিন্তু হাডুডু খেলাতেও সুনাম কুড়িয়েছিলেন। বরিশাল আর যশোরে হাডুডু খেলার প্রতিযোগিতায় টুঙ্গিপাড়ার হয়ে খেলতে যেতেন অত ছোটো বয়সে। সেই সময়

তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আব্দুল মজিদ স্যার ও বিপেন স্যারকে। খোকাকে ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন এই দুই শিক্ষক। একই সাথে প্রিয় ছাত্রকে খেলাধুলায় উৎসাহ দিতেন তাঁরা।

পুরান ঢাকার কলতাবাজার ও চকবাজারের বাসিন্দারা মিলে ১৯৩৭ সালে গড়ে তুলেছিলেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। অল্প দিনের মধ্যেই এটি দেশের জনপ্রিয় ক্লাবে পরিণত হয়। সে সময় দেশের সেরা ফুটবলাররাই ওয়ান্ডারার্সে খেলার সুযোগ পেতেন।

ঐতিহ্যবাহী এই ক্লাবের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে খেলোয়াড় শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। স্কুলে খেলতে খেলতে এক সময় তিনি প্রাদেশিক পর্যায়ের ফুটবল দলেও জায়গা করে নেন। ১৯৪০ সালের শুরুতে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের হয়ে খেলা শুরু করেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত টানা আট বছর ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের জার্সি গায়ে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলেছেন তিনি। ১৯৪৩-৪৪ মৌসুমে বগুড়ায় আয়োজিত গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। এই ক্লাবের হয়ে ফুটবলের পাশাপাশি ভলিবল, বাস্কেটবল এবং হকিতে মাঠে নেমেছেন তিনি।

ক্রীড়াপ্রেমী রাজনীতিবিদ-রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

কিশোর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগেই ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে গড়ে উঠেছিল ফুটবল ও ভলিবল দল। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক। নিজে খেলতেন, অন্যদেরকেও খেলায় উৎসাহী করে তুলতেন।

বেশ কিছুদিন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪১ থেকে আমৃত্যু ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ফুটবল-হকিতে গঠন করেছিলেন শক্তিশালী দল। ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে এই ক্লাব ঢাকা ফুটবল লিগের শিরোপা জিতেছিল। পঞ্চাশের দশকে ওয়ান্ডারার্সের টানা চার বার লিগ শিরোপা জেতার রেকর্ড আজও ইতিহাস হয়ে আছে। তখন ক্লাবটির এমন শক্তিশালী হওয়ার পেছনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনীতির কারণে নিয়মিত খেলতে না পারলেও ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক, তখনো কখনো কখনো প্রাণের টানে চলে যেতেন ক্লাব প্রাঙ্গণে। ধানমন্ডি ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খেলোয়াড়দের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলেই ১৯৭১ সালে খেলোয়াড়রা দারুণ একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি আর বাংলাদেশের মানুষ মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর তখনি গড়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা আজও চিরভাস্বর।

খেলোয়াড়দের মাঝে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৭২ সালের ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়েরা

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু এই দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে পাকিস্তানি হানাদাররা ধ্বংস করে দেয় দেশের সম্পদ। শহিদ হয়েছিলেন অনেক খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ। বিধ্বস্ত হয়েছিল খেলার মাঠ, সেখানে মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যেত শহিদের লাশ। সবকিছু সামলে নিয়ে আবার নতুন করে দেশ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের নানারকমের খেলা ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগেই গঠিত হয় নানা সংস্থা। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডসহ অন্য ফেডারেশনগুলো গঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর সময়েই। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার বর্তমান নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। দেশের সব ক্রীড়া সংস্থাই এর অধীনে।

দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন 'বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড', যা নাম বদলে এখন 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড' বা বিসিবি। এখন বিশ্বের সেরা পাঁচ ধনী ক্রিকেট বোর্ডের একটি হচ্ছে আমাদের বিসিবি। ক্রিকেট সামগ্রীর কর তখন ছিল ১৩০ শতাংশ। এ নিয়ে ক্রীড়া সংগঠকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে করের অঙ্ক কমাতে তখনকার অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে নির্দেশ দেন তিনি। করের অঙ্ক কমে গেলে ক্রিকেট ব্যাট-বল ও অন্যান্য সামগ্রীর দাম কমে গেল। সারা দেশে ক্রিকেট খেলা ছড়িয়ে পড়ার কাজটা সহজ হয়ে গেল।

ফুটবলের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠা করা 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন' বা বাফুফে অল্প দিনের মধ্যেই পেয়েছিল এএফসি ও ফিফার স্বীকৃতি। একে একে গড়ে ওঠেছিল সাঁতার, হকি, ভলিবল, অ্যাথলেটিকস, টেনিস ইত্যাদি ফেডারেশন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই নিবেদিত ক্রীড়া সংগঠকরা এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। অলিম্পিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে নতুন দেশ বাংলাদেশকে। এই ইচ্ছেতে ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠালেন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার আহ্বায়ক কাজী আনিসুর রহমানকে। খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দিতেন খুব। আর তাই ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ায় অংশ নিতে পাঠিয়েছিলেন তখনকার মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা লুত্‌ফুন নেসা বকুলের নেতৃত্বে একটি দলকে।

ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে পাস করেন 'বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অ্যাক্ট'। বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলার আধুনিক কৌশল শিখবে, এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খেলা হাডুডুরই অন্য সংস্করণ কাবাডি। এই খেলাকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেন বঙ্গবন্ধুই।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াঙ্গনের কিশোর-যুবকদের সম্পৃক্ত করার তাগিদ অনুভব করতেন বলেই নিজেই তদারকি করতেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম। ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রাখা খেলোয়াড় ও তাঁদের পরিবারের সাহায্যের জন্য ১৯৭৪ সালের ৬ই আগস্ট 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করান শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বাংলাদেশের শত্রুরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করেছিল বলে প্রস্তাবটি কার্যকর হতে পারেনি। তবে থেমে যায়নি মহান নেতার মহতী সেই স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে পাস করেন 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০১১'। এ প্রতিষ্ঠানটি ক্রীড়াবিদ ও তাদের পরিবারের উন্নয়নে কাজ করছে।

১৯৭২ সালে কলকাতা মোহনবাগান দল ঢাকা একাদশ ফুটবল দলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে ঢাকা সফর করে। বঙ্গবন্ধু সেদিনও খেলা শুরুর আগে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। বাংলাদেশ দল দেশের মাটিতে সেদিন বিখ্যাত ফুটবলার সালাউদ্দিনের দেওয়া ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ১৯৭৩ সালেও কলকাতা মোহনবাগান ও ঢাকা একাদশ দলের খেলা হয় ঢাকাতে, বঙ্গবন্ধু সেদিনও খেলা উপভোগ করেন স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে।

১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন অমিয় ভট্টাচার্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল জানিয়ে সেই ঐতিহাসিক সফরের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। বাংলাদেশ একাদশের সঙ্গে পাঁচটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিলেন তারা। এর মধ্যে দুটি ম্যাচ ড্র হয়। তিনটি ম্যাচ জেতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। জেতা তিনটি ম্যাচের প্রত্যেকটিতেই তিনি গোল করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নৈশভোজের আয়োজনে গিয়েছিলেন সবাই। বঙ্গবন্ধু সকল খেলোয়াড়কে একটি পালতোলা নৌকোর স্মারক, তসরের পোশাক আর মানপত্র উপহার দিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসের এক বিশেষ আনন্দের দিন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে (তৎকালীন ঢাকা স্টেডিয়ামে) আয়োজন করা হয়েছিল একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। নাম ছিল 'মুজিবনগর একাদশ ও প্রেসিডেন্ট একাদশের প্রীতি ম্যাচ'। মুজিবনগর একাদশে ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু, শেখ আশরাফ আলী, কাজী সালাউদ্দিনসহ অন্যরা, যারা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে গিয়ে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে যেসব খেলোয়াড়রা দেশে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রেসিডেন্ট একাদশ। এ দলে মনোয়ার হোসেন নান্নু, গোলাম সারওয়ার টিপুসহ অন্য ফুটবলাররা ছিলেন।

এই প্রীতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা মাঠে গড়ায়। সেদিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই মাঠে উপস্থিত থেকে সাদা পায়রা উড়িয়ে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সেই খেলার উদ্‌বোধন করেছিলেন। দু'জনই গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন খেলা। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দুই দলের খেলোয়াড়দেরই। প্রেসিডেন্ট একাদশ হেরে যায় ২-০ গোলে। সেদিন বঙ্গবন্ধু জনৈক খেলোয়াড়ের ব্যাক পাস দিয়ে গোল করার পদ্ধতি দেখে বলে উঠেছিলেন, সবাই তো আর হাফেজ রশীদ নন।

বঙ্গবন্ধু হাফেজ রশীদের খেলার ভক্ত ছিলেন। বন্ধুরা, জানতে ইচ্ছে করছে তো, কে এই হাফেজ রশীদ? গত শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশক ছিল বাঙালি ফুটবলারদের

১৯৭২ সালে কলকাতা মোহনবাগান দল ঢাকা একাদশ ফুটবল দলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে ঢাকা সফর করে। বঙ্গবন্ধু সেদিনও খেলা শুরুর আগে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। বাংলাদেশ দল দেশের মাটিতে সেদিন বিখ্যাত ফুটবলার সালাউদ্দিনের দেওয়া ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ আমলে বাঙালিদের মধ্য থেকে অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড়ের উত্থান ঘটেছিল। হাফেজ রশীদ সেই সময়কার বিখ্যাত খেলোয়াড়। আরো কয়েকজনের নাম বলছি- গোষ্ঠপাল, শিশির ঘোষ, শৈলেন মান্না, সৈয়দ আবদুস সামাদ, আব্বাস মির্জা, মোস্তফা, নূর মোহাম্মদ, তাজ মোহাম্মদ, মোহিনী ব্যানার্জী, জুম্মা খান, তসলীম।

বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের মাঝে সম্ভাবনা খুঁজতেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু তেমনি একজন। ঘটনাটা খুলেই বলছি তোমাদের।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকার কারণে তিনি সবার কথা মনে রাখতে পারতেন। ১৯৫৫ সালের দিকে রাজনৈতিক কাজে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বরিশালের মঠবাড়িয়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর সৌজন্যে মঠবাড়িয়া হাই স্কুলের সঙ্গে স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। জাকারিয়া পিন্টু তখন মঠবাড়িয়া স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ফুটবল খেলেন। স্কুলের পক্ষে অংশ নিয়ে দু-দুটি গোল করে অফিসার্স ক্লাবকে হারিয়ে দেন।

খেলা শেষে বঙ্গবন্ধু খুদে ফুটবলারকে কাছে ডেকে খেলার প্রশংসা করে মাথায় হাত বুলাতে থাকেন এবং তাঁর বাবা ক্যাপটেন নাজিমউদ্দিনকে ডেকে বলেন, লেগে থাকলে ছেলে তার বড়ো ফুটবলার হবে। এই উৎসাহ ছেলে এবং বাবা উভয়কেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। জাকারিয়া পিন্টু ফুটবলার হয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দল দেশের বাইরে প্রথম মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত মারদেকা কাপ ফুটবলে অংশ নিতে যাবে। পুরো ফুটবল দল গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার দাওয়াত পেয়েছে। দলের সাথে জাকারিয়া পিন্টুও আছেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখে সালাম দিতেই তিনি ঠিকই চিনতে পারেন তাকে। বলেন, 'তোকে বলেছিলাম না তুই বড়ো ফুটবলার হবি!'

মালয়েশিয়ায় দারুণ খেলেছিল বাংলাদেশ দল। স্টেডিয়াম জুড়ে মালয়েশিয়ার দর্শকরা চিৎকার করছিল 'বাংলাদেশ' আর 'শেখ মুজিব' বলে। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশকে তখন সারা বিশ্বের মানুষ চিনে ফেলেছিল শেখ মুজিবের নামেই।

বাংলাদেশ ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিন এখন বাফুফের সভাপতি। তিনি ছিলেন শেখ কামালের বন্ধু। ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে বন্ধুর সাথে প্রায়ই যেতেন তিনি। দেখা হতো বঙ্গবন্ধুর সাথেও। এক সাক্ষাৎকারে স্মৃতিকাতর সালাউদ্দিন বলেছেন, 'দেশে বা বিদেশে যেখানেই আমরা খেলতে গিয়েছি, বঙ্গবন্ধু খোঁজখবর নিয়েছেন আমাদের। আমরা একবার আইএফএ শিল্ড খেলতে কলকাতা গিয়েছিলাম। শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ফোনে উৎসাহ দিয়ে জানান, শিরোপা জিতলে খেলোয়াড়দের বিমানবন্দর থেকে নিয়ে পুরো ঢাকা শহর ঘোরানো হবে ঘোড়ার গাড়িতে। ১৯৭২ সালে কলকাতার মোহনবাগান আর ১৯৭৩ সালে রাশিয়ার মিন্সক ডায়নামো ক্লাব খেলতে আসে ঢাকায়। হাজারো কাজ বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু দুটি ম্যাচই উপভোগ করেছেন গ্যালারিতে বসে। ফুটবলে বা অন্য কোনো খেলায় ভালো করলে নতুন স্বাধীনতা পাওয়া বাংলাদেশকে যে সবাই সমীহ করবে, এটা জানতেন তিনি। সবসময় বলতেন খেলা আর রাজনীতিকে আলাদা রাখতে।' এ

জন্যই শেখ কামাল যখন আবাহনী ক্লাব গড়ে তুলছিলেন, তখন বঙ্গবন্ধুর কড়া নির্দেশ, 'রাজনীতিবিদদের ক্লাবের সঙ্গে জড়িত রাখবে না।'

১৯৭৩ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে রাশিয়ান মিন্সক ডায়নামো বনাম বাংলাদেশ একাদশ দলের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু সেদিন তার ডান দিকে শেখ রাসেল, বাম দিকে তাজউদ্দীন আহমদসহ তাঁর মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের নিয়ে গ্যালারিতে বসে খেলা উপভোগ করেছিলেন।

পরের বছর বঙ্গবন্ধুর বড়ো ছেলে শেখ কামালের গড়া দল আবাহনী কলকাতায় আইএফএ শিল্ড টুর্নামেন্ট খেলতে যায়। বঙ্গবন্ধু তাদের এই যাত্রার প্রাক্কালে আবাহনীর খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা সবাইকে বঙ্গভবনে ডেকে নিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানান। ফুটবলার সালাউদ্দিন স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে, 'শেখ মুজিবুর রহমান ফোন করে কামালকে বললেন, সব খেলোয়াড়দের জানিয়ে দিও, যদি তোমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারো তাহলে তোমাদের বিমানে করে দেশে নিয়ে আসা হবে।'

১৯৭৫ সালে মালয়েশিয়ার মারদেকা ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল। খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দলের বিদায় ক্ষণে গণভবনে ডেকেছিলেন। দলের সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ছবিও তুলেছিলেন তিনি।

এখন ঠিক এই কাজটিই করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাবার মতোই ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ তিনিও।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিনের পর দিন কারাগারে বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সন্তানদের বাবার আদর্শে বড়ো করে তুলেছিলেন। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক চর্চায় উৎসাহ দিতেন। আর তাই বঙ্গবন্ধুর সব সন্তানের মাঝেই ছিল খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ।

শহিদ শেখ কামাল

বড়ো ছেলে শেখ কামাল দাদা আর বাবার মতোই ভালো ফুটবল খেলতেন। বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও অ্যাথলেটে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয় আবাহনী ক্রীড়াচক্র এই দলে খেলেছেন শেখ কামাল। তাঁর নেতৃত্বে ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে বাস্কেটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়। একই বছর সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল চ্যাম্পিয়ন শেখ কামাল

প্রতিযোগিতায় তিনি হয়েছিলেন দ্রুততম মানব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে দ্বৈত রানার্সআপও হয়েছিলেন।

বাবার মতোই ক্রীড়া সংগঠক হয়ে উঠেছিলেন শেখ কামাল। ঢাকা মেট্রোপলিটন ফুটবল খেলোয়াড় সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। শেখ কামাল রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেওয়ার পরও খেলাধুলাই তাঁর কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল।

বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের শুরু করেছেন তিনি। দেশের ক্রিকেট উন্নয়নেও তাঁর অনেক ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের আগেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন আবাহনী ক্রীড়াচক্র নামে খেলাধুলার একটি ক্লাব, যা দেশে বিদেশে এখন সুপরিচিত। এই ক্লাবের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, শেখ কামাল ও শেখ জামালও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭৩ সালে আবাহনীর জন্য বিদেশি কোচ বিল হার্ট-কে এনেছিলেন শেখ কামাল। তখন ক্লাব তো দূরের কথা, এই উপমহাদেশের কোনো জাতীয় দলেরই কোনো বিদেশি কোচ ছিল না। ১৯৭৪ সালের কথা। আবাহনী কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'আইএফএ' শীল্ড টুর্নামেন্ট খেলতে গেছেন। সাথে বিদেশি কোচ বিল হার্ট। সুশৃঙ্খল টিম আর বিদেশি কোচ দেখে সেখানকার সবাই তো থ। এই ধারায় পরবর্তীতে উপমহাদেশের জাতীয়দল থেকে শুরু করে ক্লাব পর্যায়ে বিদেশি কোচ আনার প্রথা চালু হয়। ফলে স্থানীয় খেলোয়াড়রা পশ্চিমা স্টাইলের ফুটবলের সাথে আরো বেশি করে পরিচিত হতে শুরু করে। এই কাজটি শেখ কামালই শুরু করেছিলেন।

এক সময় ক্রিকেট বড়োলোকের খেলা বলে একে নিরুৎসাহিত করা হতো। আজকের বাংলাদেশে ক্রিকেটের জয় জয়কার, এর পেছনে অবদান রেখেছেন শেখ কামাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলে খেলতেন। পেস বোলিং করতেন, বল হাতে ওপেনিং করেছেন জাহাঙ্গীর শাহ বাদশার সঙ্গে। ব্যাট হাতেও থেকেছেন মাঠে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে সবার আগে হত্যা করা হয় শেখ কামালকে। বঙ্গবন্ধুর সন্তান হিসেবে কেবল নয়, বাংলাদেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। আজ শেখ কামাল বেঁচে থাকলে খেলাধুলায় বিশেষ করে ফুটবলে বাংলাদেশ কতটা উন্নতি করত, তা গবেষণার বিষয়। 'আবাহনী লিমিটেড' গঠন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বোন শেখ রেহানা ভাই শেখ কামালের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

শহিদ শেখ জামাল

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার মেজ ছেলে শেখ জামাল খেলতেন ফুটবল ও ক্রিকেট। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সাথে জড়িত হন। তিনি প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে আবাহনী ক্রীড়া চক্র ও আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেছেন। আবাহনী ক্রীড়া চক্রে ক্রিকেটও খেলতেন। তোফাজ্জল হোসেন

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান গেমসে লং জাম্পে চ্যাম্পিয়ন সুলতানা কামাল

স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তিনি 'শেখ জামাল একাদশ'-এর হয়ে খেলেছিলেন। সে বছর 'শেখ জামাল একাদশ' দলটি সেরা হয়। 'শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব' গড়ে উঠেছে ১৫ই আগস্টের শহিদ শেখ জামালের নামে।

শহিদ সুলতানা কামাল খুকি

আগেই বলেছি, খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দিতেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নয়াদিল্লিতে নিখিল ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ায় অংশ নিতে পাঠিয়েছিলেন তখনকার মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা লুত্‌ফুন নেসা বকুলের নেতৃত্বে একটি দলকে। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সুলতানা কামাল খুকি। যাত্রা শুরুর আগে বঙ্গবন্ধু দলের সাথে দেখা করেছেন। সুলতানা কামাল খুকিকে বললেন, 'বাঙালীর মান রাখতে পারবি তো?'
খুকির সাহসী উত্তর ছিল 'পারব।'

খুকি ওই আসরে লং জাম্প ইভেন্টে দ্বিতীয় হন। এটাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের হয়ে প্রথম কোনো পদক জয়। দেশে ফেরার পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু খুকিকে বাহবা দিয়েছিলেন খুব। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে এই খুকিকেই বড়ো ছেলে শেখ কামালের সাথে বিয়ে দেন বঙ্গবন্ধু। পুত্রবধূ খেলোয়াড়, বিষয়টা অনেক পরিবার এখনো মেনে নিতে পারে না। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবার বরং খুব আনন্দের সাথে খুকিকে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে হার্ডলসে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। অথচ ১৫ই আগস্টের কালরাতে সবার সাথে শহিদ হন সুলতানা কামাল খুকিও। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র নিভে যায় চিরতরে।

ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলায় উৎসাহী ছিলেন খুকি। ১৯৬৬ সালে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের লং জাম্পে রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জিতে নেন স্কুল পড়ুয়া খুকি। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক গেমসে লং জাম্পে নতুন রেকর্ড গড়ে চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৭০ সালে অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের মধ্যে সেরা হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ১০০ মিটার হার্ডলসেও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। রোকেয়া হল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অ্যাথলেটিক্সের 'গোল্ডেন গার্ল' খেতাব পেয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাথলেটিক্সে প্রথম নারী 'ব্লু' সুলতানা কামাল খুকি। নিজে খেলতেন, আবার মেয়েদের মাঝে খেলার উৎসাহ ছড়িয়ে দিতেও কাজ করতেন সুলতানা কামাল।

ক্রীড়াপ্রেমী বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপের ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ফাইনাল খেলছে বাংলাদেশ। তুমুল উত্তেজনা মাঠে। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। বিরতির পর স্নায়ু চাপ কিছুটা কাটিয়ে ওঠে টপাটপ দুই গোল পরিশোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে বাংলাদেশ দল। শেষ মিনিটের গোলে বাংলাদেশ ৩-২ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়।

শত ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে ৬৫ মিনিট মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমি ভাবিনি বাংলাদেশ এ আসরের ফাইনালে উঠবে। তারা খুবই ভালো খেলেছে। ফাইনালে পরপর দুটি গোলও দিয়েছে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম পরবর্তী টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে।'

খোঁজ নিয়ে দেখো, কয়টি দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে খেলার মাঠে গিয়ে হাজির হন? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো সন্তান হিসেবে বাবার মতোই ক্রীড়াপ্রেমী হয়েছেন বলেই তিনি এই কাজটি করেন। প্রায়ই গণভবনে দেখা যায় খেলোয়াড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন প্রধানমন্ত্রী। যে-কোনো বড়ো ম্যাচের আগে, বিদেশ সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী নিজে সবাইকে উৎসাহিত করবেন, এ এখন নিয়মিত ঘটনা। খেলোয়াড়রা যেন নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে খেলেন, সেই উৎসাহ জোগাতে পুরস্কার ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর আগে বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধান এই কাজটি করেছেন বলে জানা যায়নি।

খেলোয়াড়ি মনোভাব বাবার মতোই মেয়েরও স্বভাবজাত। সহজ ভঙ্গিতে খেলোয়াড়দের বলেন ,'হারলেই শেষ নয়। খেলায় হার জিত আছেই।' একবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিন। শচীনও তো ১ বলে আউট হয়েছেন অনেকবার।'

তরুণ ক্রিকেটার কাটার মাস্টার খ্যাত মুস্তাফিজের কাঁধে অস্ত্রোপচার হবে। টেলিফোনে খোঁজখবর নিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বখ্যাত অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বেড়াতে যান প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে রান্না করে খাবার পাঠালেন সাকিবের বাড়িতে। ভাবা যায়!

তৃণমূল থেকে ফুটবলার তুলে আনতে দেশব্যাপী ১ লাখ ৩০ হাজার দল আর প্রায় ২ কোটি শিশু খেলোয়াড় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শুরু করেন 'বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা

গণভবনে ছেলে ও নাতির সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফুটবল টুর্নামেন্ট'। একবার ঘটেছিল এক অসাধারণ ঘটনা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফুটবল খেলা দেখতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন ক্রীড়াপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ময়মনসিংহের পাঁচরুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা। তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় লালমনিরহাটের টেপুগাড়ি বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই কান্নায় ভেঙে পড়ে টেপুগাড়ি বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা। কিছুতেই তাদের কান্না থামছিল না। স্কুলের শিক্ষকরাও ব্যর্থ হচ্ছিলেন তাদের কান্না থামাতে। এমনকি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উঠেও কাঁদছিল মেয়েরা।

মেয়েদের গলায় পদক পরিয়ে প্রধানমন্ত্রী বুকে টেনে নেন এক একজনকে। মায়ের মমতায় আরেক হাত দিয়ে মুছে দেন কান্নারত মেয়েদের চোখের পানি। সান্ত্বনা দিলেন, দিলেন আরো ভালো খেলার প্রেরণা। মেয়েদের চোখের পানি মুছে দেওয়ার সেই দৃশ্য বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের বড়ো পর্দায় ভেসে উঠল। আবেগ ছড়িয়ে গেল পুরো স্টেডিয়ামে।

এ-ই হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অবসর সময়ে নিজে ব্যাডমিন্টন খেলেন। তবে ভালোবাসেন সব খেলাই। ভালোবাসেন খেলোয়াড়দেরও। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, তাঁর সোনার বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা খেলার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে পরিচিত করে তুলবে বাংলাদেশকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই স্বপ্নকে সফল করতে কাজ করছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন সেরা ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশের আর্চার রোমান সানা সরাসরি খেলবেন অলিম্পিকে। এ রকম নানা সাফল্যের খবরে এখন আর আমরা আকাশ থেকে পড়ি না। কেননা, আমরা জানি এ রকমটা হবেই। বাংলাদেশকে ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাওয়া মানুষটার জন্য কেবলি শুভকামনা উঠে আসে হৃদয় থেকে। ■

খেলাধুলা প্রিয় প্রধানমন্ত্রী

তিনি শুধু একজন প্রধানমন্ত্রী নন, ক্রীড়া অনুরাগীও। শত ব্যস্ততার মাঝেও ছুটে যান মাঠে খেলা দেখতে। গ্যালারিতে বসে উৎসাহ দেন খেলোয়াড়দের। আবার শিশুদের ভালোবেসে মেতে উঠেন খেলার সঙ্গী হয়ে।

সবুজ মাঠের বালক

কুররাতুল আইন সানজিদা

গাঁয়ের বুকে বেড়ে ওঠা তার
সবুজ খেলার মাঠে,
বাতাবি লেবু বল বানিয়ে
খেলত সবার সাথে।

পাঠ শেষ হলে প্রখর রোদেও
জমত স্কুলের মাঠ,
গাঁয়ের বালক আপন মনে
ছুটত মেলে হাত।

রোদে পুড়ে-ঘেমে একাকার
তবু খেলা থামবার নয়,
দারুণ কোনো খেলুড়ে ভেতরে
মিশে ছিল নিশ্চয়।

বল খেলা শেষে নতুন খেলা
দেয় ঝাঁপ সে দিঘিতে,
দিঘির পানিও পেরে ওঠে না
সাঁতারে তাকে হারাতে।

এক ডুবে তোলে তলের মাটি
খেলে যায় নিরবধি,
এক সাঁতারে পার করে যায়
গাঁয়ের ছোট্ট নদী।

ধানকাটা শেষে নাড়ার ক্ষেতে
বসতো চড়ুইভাতি
রান্না হতো মাটির চুলোয়
কতই রঙিন স্মৃতি

খেলা নয়, সে তো মুক্ত পাখা
মেলে একবার ধরে,
অন্তহীন এই ধানের ক্ষেতে
আসত সে যে উড়ে।

কলাগাছ কেটে বালক দলে
গড়ত শখের ভেলা,
দুরন্ত সে যে নাওয়া খাওয়া ভুলে
কাটিয়ে দিতো বেলা

কত খেলা তার লড়াই, কুস্তি
কাবাডি, গোল্লাছুট,
আর ইচিং-বিচিঙের কাছে
ক্রিকেট কেবল ঝুট।

বিকেল শেষে সূর্য লুকায়
লুকায় ছেলের দল,
মন ভার, ভাবে 'আরেকটু যদি
খেলত সবাই বল।'

বেলা পড়ে আসে গ্রামের সাঁঝে
ঝিঁঝি পোকা ওঠে ডেকে,
দূরন্ত মাঠ, কলকল নদী
এসেছে সে দূরে রেখে।

কতদিন হলো! মনে পড়ে মাঠ
প্রাণপ্রিয় ছোটো নদী
আবার কখনো গাঁয়ের মাঠে
খেলা হতো তার যদি।

মনে পড়ে কত খেলার সাথি
অবাধ খেলার ঝোঁক
লেখা রয়ে আছে স্মৃতির পাতায়
সে এক মেঠো বালক।

দ্বাদশ শ্রেণি
জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ

শৈশবের খেলাধুলা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

আবহমানকাল থেকে বিচিত্র খেলাধুলায় ভরপুর ছিল গ্রামবাংলা। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে সেসব। ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে অনেক। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোও বিলীয়মান প্রায়। দেশীয় খেলাগুলো আজ শুধু বয়স্কদের স্মৃতিকাতর করে। দুই দশক আগেও গ্রামের মাঠঘাট, পথে-প্রান্তরে এসব খেলায় ব্যস্ত শিশু-কিশোরদের জটলা দেখা যেত, যা এখন চোখে পড়ে কম।

নিবন্ধ

বিশ্বায়ন আর 'মাল্টিমিডিয়া গেমসের' এই যুগে শহুরে যান্ত্রিকতা স্পর্শ করেছে গ্রামকেও। বর্তমান প্রজন্মের গ্রামের শিশু-কিশোরটিও স্মার্টফোনে অনলাইন-অফলাইন গেমসে বুঁদ। অথচ এককালে আমাদের অজপাড়াগাঁয়ের মানুষই শরীর ও জ্ঞানচর্চামূলক চিত্তবিনোদনের জন্য অসংখ্য খেলার জন্ম দিয়েছে, যেগুলোয় পল্লি জীবনের ও সাধারণ মানুষের সৃজনশীল মনের ছাপ পাওয়া যায়। নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে বাঙালির জাতীয় চরিত্র, জীবনধারা ও ঐতিহ্য।

লোকায়ত খেলাধুলার উদ্ভব কোন সময়ে, তা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, অনার্য বা দ্রাবিড় যুগ থেকেই এসব খেলার উদ্ভব। প্রাচীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, রীতিনীতি ও অনেক বিশ্বাস জড়িয়ে আছে এসব খেলার সঙ্গে। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আত্মরক্ষার্থে প্রচলন ঘটে দৌড়, কুস্তি ও লাঠিখেলার মতো কিছু খেলা। ব্রিটিশ জাতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার জন্য ঘুড্ডি বা ঘুড়ি খেলার প্রচলন ঘটে।

ঘরে-বাইরে, জলে ডাঙায় সর্বত্রই রয়েছে লৌকিক খেলা। কোনো খেলায় শারীরিক কসরত মুখ্য, কোনোটায় মানসিক। আবার ছন্দের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে এমন

অনেক খেলার মূল আকর্ষণই হচ্ছে আঞ্চলিক ছড়া, যা খেলোয়াড়দের দেহ ও মনকে চাঙা করে। কিছু খেলায় লোকবিশ্বাস ও মন্ত্রেরও প্রভাব আছে। এ জাতীয় খেলাগুলোয় খেলোয়াড় বণ্টনের পদ্ধতিগুলোও বেশ নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ।

নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, ধৈর্য, একতা, নৈতিকতা, বন্ধুত্বসহ বিভিন্ন গুণের বিকাশ ঘটে গ্রামীণ খেলার মাধ্যমে। এ জাতীয় প্রায় সব খেলায়ই নেতৃত্ব থাকে, খেলা ভেদে যাকে দলপতি, রাজা, বউ, বর, বুড়ি প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। কোনো কোনো খেলায় রেফারি বা মধ্যস্থতাকারীও অত্যাবশ্যক।

শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সি নারী ও পুরুষের জন্য প্রচলন রয়েছে পৃথক পৃথক খেলার। কোনো কোনো খেলা শুধুই মেয়েদের জন্য। কোনো খেলা কেবল ছেলেদের জন্য। কিছু খেলা আছে যেগুলোয় ছেলে ও মেয়ে উভয়েই অংশ নিতে পারে।

ছেলেদের খেলা

ডাংগুলি: ডানপিটে স্বভাবের চঞ্চল কিশোরদের প্রিয় খেলা ডাংগুলি। অঞ্চলভেদে এর অন্য নাম ডান্ডাগুলি বা ডান্ডাকুলুক। ডান্ডাগুলি খেলতে প্রয়োজন এক বা দেড় হাত দৈর্ঘ্যের একটি সমান লাঠি, যার ব্যাসার্ধের আকৃতি এক বা দেড় ইঞ্চি। এই লাঠিটিই ডান্ডা বা ডাং। এর সঙ্গে চার থেকে ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের আরেকটি লাঠি, ছোটো একটি লাঠিকে বলে গুলি। আসলে ডাংগুলি খেলার সঙ্গে ক্রিকেট খেলার কিছু মিল রয়েছে। ডান্ডা দিয়ে গুলি ছোড়া ও ক্রিকেটের ব্যাট দিয়ে বল মারার মধ্যে মিল আছে। উভয় খেলারই আনন্দের বিষয় 'ক্যাচ ধরা'।

মার্বেল/বিঘত: ওপার বাংলায় প্রয়াত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আক্ষেপের সুরে ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন 'একটি রয়েল গুলি কিনতে পারিনি কখনো/লাঠি লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে/লস্কর বাড়ির ছেলেরা।'

মার্বেল নামে পরিচিত ছোটো কাচের বলকে 'রয়েল গুলি' বলেছেন কবি, যা দিয়ে খেলার প্রতি শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের দৃষ্টান্ত তাঁর এই কবিতা। এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক ধরনের নেশা। রাখাল বালক থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া শিশু-কিশোর পর্যন্ত সবার ভীষণ আকর্ষণ ছিল এই খেলার প্রতি। স্কুল ব্যাগের ভেতর বইয়ের পাশাপাশি মার্বেল রাখা ছিল অনেকের নিয়মিত অভ্যাস। গ্রামের শিশু-কিশোরদের পকেটে সবসময় কিছু না কিছু মার্বেল থাকত। গ্রামের পায়ে চলার সরু পথ ছিল মার্বেল খেলার উপযুক্ত স্থান। দু'পাশে বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়ের মাঝে পায়ে চলার পথ। রাজশাহী অঞ্চলে এটাকে বলে বিঘত খেলা। কিছু এলাকায় শিশুদের এখনো মার্বেল খেলতে দেখা যায়।

গাইগোদানী খেলা: গরু, ছাগল বা ভেড়ার পাল খোলা মাঠে ছেড়ে দেওয়ার পর রাখালের হাতে কাজ তেমন একটা থাকত না। তখন মাঠের রাখাল বালকেরা এক সাথে এই খেলা খেলত এ খেলায় প্রত্যেকের হাতে থাকত একটি ছুঁচালো লাঠি। এটাই গাইগোদানী খেলার প্রধান উপকরণ। খেলার জন্য দরকার নরম ও স্যাঁতসেঁতে মাটি। টসে সর্বপ্রথম লাঠি ছোড়ার অধিকার অর্জনকারীকে 'গাই' বলা যায়। আর লাঠি মাটিতে পোতাকে বলা হয় 'গোদানী। 'গাই' এবং 'গোদানী' শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে খেলাটির নাম হয়েছে 'গাইগোদানী'। এই খেলায় ওপর থেকে লাঠি এমনভাবে ছুড়তে হবে যাতে সেটি মাটিতে বিদ্ধ হয়। ছুড়ে দেওয়া লাঠি যে খেলোয়াড় যত শক্ত ও সোজাভাবে মাটিতে পুঁততে পারবে, সেই জয়ী।

লাটিম: গ্রামের ধুলো মাটি মেখে বড়ো হয়েছে অথচ লাটিম ঘোরায়নি বা এই খেলার আনন্দ উপভোগ করেনি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। গ্রামে আজও একটি কথা প্রচলিত 'এমন মার দেবো যে লাটিমের মতো ভোঁ ভোঁ করে ঘুরবি।' গ্রামবাংলায় এখনো বিচ্ছিন্নভাবে লাটিম খেলা দেখা যায়। তবে কেবল লাটিম হলেই তা ঘোরানো যায় না। এর সঙ্গে দরকার চিকন, লম্বা ও সাদা রশি, যাকে বলা হয় 'লেপতি'। লাটিমের সঙ্গে লেপতি প্যাঁচানোর রয়েছে বিশেষ নিয়ম। লেপতি জড়ানোর ওপর নির্ভর করে একটি লাটিম কতক্ষণ ঘুরবে। কখনো একা কখনোবা

দলবেধে লাটিম খেলতে পারে। এই খেলার সবচেয়ে উত্তেজনাকর মুহূর্ত হচ্ছে লাটিম দুই ভাগ করে ফেলা। যদি কোনো খেলোয়াড় নিজের লাটিম দিয়ে অন্যের লাটিম ভেঙে ফেলতে পারে তাহলে তার গর্বের শেষ থাকে না। কার লাটিম কতক্ষণ ঘোরে তা নিয়েও প্রতিযোগিতা হয়।

সাতচারা: বল দিয়ে গ্রামে চলে ভিন্ন ধরনের এক খেলা, যার নাম সাতচারা। বল ছাড়াও এতে থাকে সাত টুকরা মাটির চারা। সাধারণত ভাঙা মাটির জিনিসপত্র থেকে এই চারা সংগ্রহ করে খেলোয়াড়রা। এই খেলায় দুটি দল থাকে। যে দল বল মারার সুযোগ পাবে, ওই দলের খেলোয়াড়রা পর্যায়ক্রমে সাত চারার স্তূপ লক্ষ্য করে বল ছুড়বে। বল চারায় লাগার পর চারাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আর বল চলে যায় দূরে। প্রতিপক্ষ দল ওই বল কুড়িয়ে আনার আগেই বোলারসহ তার দলের খেলোয়াড়দের চারাগুলো সাজাতে হয়। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যত দ্রুত সম্ভব বলটি এনে তা মেরে দেয় তাদের গায়ে। যদি বলটি গায়ে লাগার আগেই তারা চারার স্তূপটি গুছিয়ে ফেলতে পারে, তবে জিতে যাবে তারা। আর যদি এর আগেই তাদের কারও গায়ে বল লেগে যায় তাহলে প্রতিপক্ষ দল চারার স্তূপে বল ছোড়ার সুযোগ পাবে।

গুলতি: গ্রামের চঞ্চল কিশোরদের মধ্যে একসময় গুলতি খেলা ছিল অসম্ভব জনপ্রিয়। ডানপিটে ও চঞ্চল স্বভাবের কিশোরদের কোমরে গুলতি গোঁজা থাকত। যেখানে তাক করে সেখানে যদি লেগে যায় তবে কিশোরের একক আনন্দের শেষ থাকে না। কার নিশানা সবচেয়ে ভালো এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয় তাদের মধ্যে। এককালে মনে করা হতো, শৈশবে গুলতি মারতে যারা ভালো দক্ষ তারা পরবর্তীকালে নামকরা শিকারি হয়ে ওঠে।

গেছো বা গাচ্ছুয়া: ধারণা করা হয়, আদিম যুগে মানুষ যখন হিংস্র জন্তুর ভয়ে গাছে চড়ে আত্মরক্ষা করত তখন থেকেই খেলাটির প্রচলন। আত্মরক্ষার এই ব্যাপারটি কালে কালে খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। বানর যেমন এ ডাল থেকে সে ডালে ছুটে বেড়ায় তেমনি দুরন্ত শিশু-কিশোররা এ খেলার মধ্যদিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। যেসব গাছের ডাল শক্ত অর্থাৎ সহজে মট করে ভেঙে যায় না সেসব গাছকে বেছে নেয় দুরন্ত শিশুরা। একদল গাছে চড়ার পর আরেক দল থাকে নিচে। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়দের সর্দার ও গাছে চড়া খেলোয়াড়দের সর্দারের মধ্যে সওয়াল-জবাব হয়। যা শুরু হয় অনেকটা এভাবে:

'গাছে উঠছিস ক্যান?/বাঘের ডরে/বাঘ কই?/মাডির তলে/. . '।

সাত চারা খেলা

শেষে জানতে চাওয়া হয়:
'তোর কয়ডা পুত?/সাত কুড়ি পুত/একটা পুত দিবি?/ছুইতাল্লে নিবি।'

এভাবে ছড়া কাটা শেষ হলেই গাছে চড়া দলের সকলে মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। আর মাটিতে থাকা দল চেষ্টা করে প্রতিপক্ষকে ছুঁয়ে দিতে। মাটিতে থাকা কেউবা গাছে চড়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার জন্য। শুরু হয় গাছের ডালে ডালে লাফালাফি। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী সকলকে গাছে চড়ায় যথেষ্ট দক্ষ হতে হয়। নইলে একদিকে রয়েছে হেরে যাওয়ার ভয়।

মেয়েদের খেলা

চার কড়ি: খেলার উপকরণ চারটি কড়ি। পাকা মেঝেতে ফাঁকা জায়গা সামনে রেখে খেলোয়াড়রা গোল হয়ে বসে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রথমে চার ফেলতে হবে। একই সঙ্গে চারটি কড়ি উপুড় অবস্থায় পড়লেই চার হিসেবে ধরা হয়। যতক্ষণ চার না পড়বে ততক্ষণ কোনো খেলোয়াড়ই খেলার পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। বেশ সাধনা ও ধৈর্যের খেলা এটি। চার কড়ি খেলার অন্যতম আকর্ষণ আট পয়েন্ট। সবগুলো কড়ি চিৎ পড়লে আট পয়েন্ট। এই আট পয়েন্ট নিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে শুরু হয় কাড়াকাড়ি। যার হাত দিয়ে আট পড়বে সেসহ সকলের অধিকার থাকে এই আট পয়েন্টের ওপর। তাই কাড়াকাড়ি করে কে, কয়টা কড়ি নিতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলে।

বউরানি: গ্রামবাংলার মজাদার খেলাগুলোর একটি হচ্ছে বউরানি, যা 'ওপেনটি বায়স্কোপ' নামেও পরিচিত। ছড়া, চালাকি ও বুদ্ধিমত্তা এই খেলার বৈশিষ্ট্য। পড়ন্ত বিকেলে গ্রামের তরুণী, কিশোরী ও যুবতীরা দলবেধে এই খেলায় অংশ নেয়। খেলাটি একটু জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি, তবে খুবই আনন্দদায়ক। দশ থেকে কুড়ি বা পঁচিশজন খেলোয়াড় ওপেনটি বায়স্কোপ খেলতে পারে। শুরুতে দুজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। তারা মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেকে দুহাত উঁচু করে একজনের হাতের আঙুলের খাঁজে আরেকজনের আঙুল দিয়ে গেট তৈরি করে। এরপর খেলোয়াড়রা পরস্পরের ঘাড় অথবা কোমর ধরে সারিবদ্ধভাবে গেটের ভেতর দিয়ে হেঁটে যায়। তখন দুজন রাজা একত্রে ছড়া কাটতে থাকে, আর খেলোয়াড়রা লাইন ধরে গেট পার হয়।

ছড়াটি হচ্ছে-'ওপেনটি বাক্সো, নাই কোনো ট্যাক্সো/সুলতানা বিবিয়ানা, সাহেব-বাবুর বৈঠকখানা/রাজবাড়িতে গিয়েছি, পান সুপারি খেয়েছি/যার নাম রেনুমালা/তারে দিলাম মুক্তার মালা।"

ছড়াটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে খেলোয়াড় দুই রাজার হাতের নিচে থাকবে তাকে হাত দিয়ে ঘেরাও করা হবে। ওই খেলোয়াড় তখন লাইনচ্যুত হয়ে পাশে দাঁড়াবে। আবার ছড়া কাটতে শুরু করবে এবং খেলোয়াড়রা তাদের হাতের নিচ থেকে হাঁটতে থাকবে। এভাবে সব খেলোয়াড় ধরা পড়ার পর শেষ হয় মূল খেলা। দেশের একেক অঞ্চলে এই খেলার বিভিন্ন নাম রয়েছে। খুলনা অঞ্চলে বলা হয় ওপেনটি বায়স্কোপ, ময়মনসিংহ অঞ্চলে টুকাটুকি, কুষ্টিয়া অঞ্চলে গোলাপ টগর ও রাজশাহী অঞ্চলে চড়ন খেলা নামে পরিচিত এই মজার খেলা।

ডা-ব্বা: ডা-ব্বা শব্দটি গ্রামে বেশ পরিচিত। ডা-ব্বা নামে কিশোরীদের একটি খেলা রয়েছে। দুই, তিন বা সর্বোচ্চ চারজন এই খেলায় অংশ নিতে পারে। ডা-ব্বা অর্থ বিঘত। বিঘত দিয়ে মেপে এই খেলা হয় বলে একে বলা হয় ডা-ব্বা খেলা।

চান্দা: জনপ্রিয় এই খেলাটি অঞ্চলভেদে চান্দা, কুতকুত, ছি কুতকুত বা কিতকিত নামে পরিচিত। গ্রাম্য কিশোরী বা তরুণীদের প্রিয় এই খেলাটি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। শরীরচর্চা এবং অধিক সময় দম রাখার অভ্যাস তৈরি করে এই খেলা। খেলতে নির্দিষ্ট কোর্টের প্রয়োজন হয়। এই কোর্ট দেখতে মইয়ের মতো। পাঁচ বা ততোধিক ঘর কেটে এই কোর্ট তৈরি করা হয়। সমতল মাটি বা পাকা মেঝেতে মাটি, চক, কাঠি বা কালি দিয়ে তৈরি করা হয় কোর্ট। মাটির হাঁড়ি বা পাতিল ভাঙা একটি চারা কিতকিত খেলার উপকরণ। এটি দেড় বা দুই ইঞ্চি হবে। কিতকিত কোর্টের শেষ ঘরটিকে বলে জিরানোর ঘর। নিয়মমাফিক অন্যান্য ঘর অতিক্রম করে

কুতকুত খেলা

ওই ঘরে পৌঁছানোই খেলোয়াড়ের লক্ষ্য।

আঁচাবাটিঃ এটি দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে টোপাভাতি নামেও পরিচিত। 'টোপা' অর্থ মাটির পাত্র আর 'ভাতি' মানে ভাত রান্না। আর 'আঁচা' হচ্ছে নারকেলের শক্ত খোলস আর 'বাটি' হচ্ছে পাত্র। খেলার নাম শুনেই এর ধরন বোঝা যায়। এই খেলায় কৃত্রিম ঘর তৈরি করা হয়। ছোট্ট মাটির চুলা তৈরি করা হয়। মাটির পাত্র ভাঙা চারা দিয়ে তৈরি হয় রান্নার কড়াই। চালের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হয় ধুলো মাটি, তুষ বা কুড়া। চিনি বা লবণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বালু বা ধুলা মাটি। রাঁধুনিরা নিজেদের রান্না আগে নিজেরা খায় না। বাড়ির বয়স্কদের কাছে নিয়ে যায়। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচিদের মধ্যে যারা শিশুদের খুবই প্রিয় তাদের কাছে হাজির করা হয় এসব খাবার। খাবার সম্পর্কে মন্তব্য না করা পর্যন্ত তাদের রেহাই মেলে না। লবণ কম হয়েছে কিনা, ঝাল ঠিক আছে কিনা, হলুদ বেশি হয়েছে কিনা এসব মন্তব্য শুনে রাধুঁনিরা তৃপ্ত হয়।

পালকি খেলাঃ এক সময়ে পালকি ছিল দেশের প্রধান যানবাহন। পরবর্তীতে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে বিয়ে-শাদিতে। অনুকরণপ্রিয় শিশু চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পালকির অনুকরণে তারা এক প্রকার খেলার জন্ম দেয়। এই খেলাটি পালকি খেলা নামে পরিচিত। খেলাটি সম্পর্কে মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান লিখেছেন, 'কলাগাছের খোলস দিয়ে বড়োদের সহায়তায় পালকির মতো তৈরি করা হয়। একটি কঞ্চি সেটে এটিকে বহনোপযোগী করা হয়। দু'দিকে বাড়ানো কঞ্চি বা পাট কাঠি কাঁধে নিয়ে খেলোয়াড়রা বেহারাদের মতো ভারিক্কি চালে হাঁটে। মাঝে মাঝে কঞ্চিতে লাঠি ঠেকিয়ে কাঁধ বদল করে ছড়া আবৃত্তি করেঃ

'ঢেং ঢেং সোয়ারি বউয়ের মাথাত তাগারি
বউ বড়ো ভারী, তাল গাছের গুঁড়ি।'

পালকি তৈরি ছাড়াও দুটি পুতুল বানানো হয়। এর একটি বর, অপরটি কনে। এই বর ও কনে পুতুল দুটিকে তারা কলাগাছের খোলস নির্মিত পালকিতে মুখোমুখি বসায়। এরপর পালকিটি কাঁধে নিয়ে দু'জন খেলোয়াড় বেহারা সাজে। বর ও কনের বাড়ি বহুদূর কল্পনা করে বেহারারা ঘাবড়ে যায়। এমনিভাবে চলতে চলতে যখন তারা বাঘের অথবা ডাকাতের কবলে পড়ে তখন কাঁধের পালকি মাটিতে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। খেলাটি এখানেই শেষ।

ঝুমুর ঝুমুরঃ ঝুমুর ঝুমুর চপলা চঞ্চলা কিশোরীদের জনপ্রিয় খেলা। বুদ্ধিমত্তা, শারীরিক কসরত ও দম ধরে রাখা খেলার বৈশিষ্ট্য। কেবল মেয়েরাই এই খেলায় অংশ নেয়। খেলোয়াড়ের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। হাত ভাঙানোর মাধ্যমে খেলার শুরু। ছড়া বলতে বলতে হাত ঘোরানো এবং মাটিতে ফেলাকে বলা হয় হাত ভাঙানো। পড়ন্ত বিকেলে গ্রামের কিশোরীরা জড়ো হয় কোনো বড়ো উঠান বা আঙিনায়। প্রত্যেকে তাদের নিজের দু-হাত ঘুরাতে থাকে। হঠাৎ সবাই হাত ফেলে মাটিতে। কেউবা উপুড় করে কেউবা চিৎ করে। একমাত্র যার হাত বিপরীত দিকে না পড়বে সেই চোর। যতক্ষণ একজনের হাত বিপরীত দিকে না পড়ে ততক্ষণ চোর নির্ধারণ হয় না। এ জন্য বারবার হাত ভাঙাতে হয়। কয়েক দান খেলার পর কারো না কারো হাত বিপরীত দিকে পড়ে।

গোল্লাছুটঃ পড়ন্ত বিকেলে আজও গ্রামের মাঠে-ঘাটে সীমিত গণ্ডিতে গোল্লাছুট খেলা ঘিরে চলে হই-হুল্লোড়। দৌড়ঝাঁপ, চালাকি ও বুদ্ধিমত্তা গোল্লাছুটের বৈশিষ্ট্য। এটি মূলত মেয়েদের খেলা হলেও অঞ্চলভেদে কিশোরাও এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। গোল্লাছুট খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা হিসেবে খোঁড়া হয় একটি গর্ত। এই গর্তে থাকে একটি কাঠি। এই কাঠির নাম 'গোল্লা'। বাইরে থাকে আরেকটি সীমানা। গর্ত থেকে এই সীমানার দূরত্ব হবে ৪০ থেকে ৫০ হাত। বাইরের সীমানা ইট, পাথর বা গাছ দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে ওই সীমানা ছোঁয়াই খেলোয়াড়ের লক্ষ্য। তবে অন্তরায় বিপক্ষের খেলোয়াড়। আগে থেকেই তারা সুবিধা মতো স্থানে ওত পেতে থাকে। হাত ছুটে যাওয়া খেলোয়াড়কে সীমানা ছোঁয়ার আগে ছুঁয়ে দিতে পারলেই সে পচে যাবে অর্থাৎ খেলা থেকে বাদ পড়বে। এভাবে একে একে খেলোয়াড় পচা হতে থাকে।

ঘরের খেলা

পুতুল খেলাঃ গ্রামবাংলার ধুলো মাটি মেখে বড়ো হয়েছে অথচ পুতুল খেলেনি এমন কিশোরী খুঁজে পাওয়া কঠিন। পড়ন্ত বিকেলে, রিমঝিম বর্ষা বা অবসর সময়ে মেয়েরা সময় কাটাতে পুতুল খেলে। বিছানায়, পড়ার টেবিলে বা স্কুল ব্যাগে সবসময় থাকত পুতুল। কে, কত সুন্দর ও আকর্ষণীয় পুতুল বানাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলত। এ খেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুতুলের বিয়ে। বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বিয়ে উপলক্ষে রচিত হয়েছে ছড়া বা গান।

জোড়-বেজোড়ঃ গ্রামবাংলায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা জোড়-বেজোড় খেলার মাধ্যমে অবসর সময় কাটায়। কমপক্ষে দু'জন জোড়-বেজোড় খেলতে পারে। খেলার উপকরণ শিম, তেঁতুল, রয়না বা অন্য কোনো ফলের বিচি। মাটি বা ইটের টুকরো দিয়েও খেলা চলে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের চোখের আড়ালে হাতের মুঠোয় নেওয়া হয় খেলার উপকরণ। সাধারণত দু'হাতে উপকরণ নিয়ে হাত পেছনে ধরে জোড় বা বেজোড় ঘুঁটি ধরা হয়। দুটি, চারটি, ছয়টি ঘুঁটি ধরলে তাকে বলা হয় জোড়। আর একটি, তিনটি বা পাঁচটি ধরা হলে তাকে বলা হয় বেজোড়। যদি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় ঠিকমতো বলতে পারে জোড় না বেজোড়, তাহলে ঘুঁটিগুলো তার হয়ে যায় এবং যে ঘুঁটি ধরেছিল তাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে হয়। আর যদি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় বলতে না পারে, তাহলে যতগুলো ধরা হয়েছিল ততগুলো ঘুঁটি দানধারী খেলোয়াড়কে দিতে হবে। কোনো কোনো অঞ্চলে জোড়-বেজোড় খেলায় ঘুঁটির সংখ্যা ধরা হয়। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলতে হবে হাতের মুঠোয় কয়টা ঘুঁটি ধরা হয়েছে। এভাবে অন্তত একজন ফতুর না হওয়া অবধি চলতে থাকে খেলা।

গোল্লাছুট খেলা

বিশ কাঠি: বিশটি কাঠি দিয়ে খেলা চলে বলে এর নাম বিশ কাঠি। বাচ্চাদের খেলা এটি। ম্যাচের কাঠি বা ঝাড়ুর শলা দিয়ে হতে পারে খেলার উপকরণ। একেকজন করে খেলোয়াড় হাতে বিশটি কাঠি নিয়ে তা মাটিতে ছুড়ে দেয়। এরপর একে একে টুকরোগুলো হাতে তুলতে হবে। তবে খুব সাবধানে। কারণ কাঠিগুলো তোলার সময় অন্য যে- কোনো একটি কাঠি সামান্য নড়লেই খেলোয়াড় আউট। দান চলে যাবে অন্য খেলোয়াড়ের হাতে। খেলা চলাকালে ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমিতে মেতে ওঠে। খেলোয়াড় যখন ধীরে-সুস্থে একমনে কাঠি তোলার চেষ্টা করে তখন প্রতিপক্ষ চেষ্টা করে তার ব্যাঘাত ঘটাতে। এ জন্য মুখে হাই, হুই শব্দ করা বা শিস বাজানো হয়। কাতুকুতু বা সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য হাত না ছোঁয়ালেও হাত এগিয়ে নেওয়া হয় শরীরের কাছাকাছি। এভাবে আনন্দ আর ঝগড়াঝাটির মাঝেই শেষ হয় বিশ কাঠি খেলা।

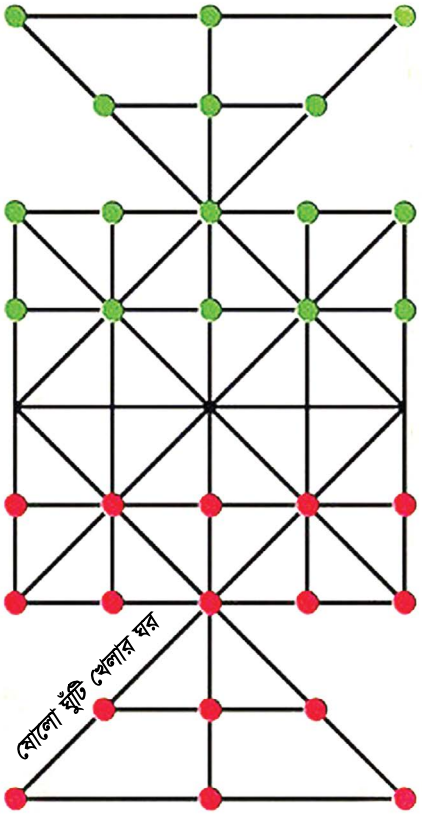

ষোলো ঘুঁটি: ষোলো ঘুঁটি ধৈর্য, সতর্কতা ও কৌশলের খেলা। ষোলো ঘুঁটি খেলা চলার সময় ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই। হাতে সময় নিয়ে খেলতে বসতে হয়। খেলায় অংশ নিতে পারে দুজন। সমতল ভূমি বা পাকা মেঝেতে খেলার ছক আঁকা হয়। দুই খেলোয়াড়ের ষোলোটি করে বত্রিশটি ঘুঁটি ছকের বত্রিশটি পয়েন্ট দখল করে রাখে। ষোলো ঘুঁটিকে বলা হয় দাবা খেলার গ্রাম্য সংস্করণ। দাবা খেলার সঙ্গে ষোলো ঘুঁটি খেলার বেশ মিল রয়েছে। তবে ষোলো ঘুঁটি খেলার উদ্ভব হয়েছে আগে। দাবা খেলায়ও ষোলোটি করে বত্রিশটি ঘুঁটি থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি 'মোগল-পাঠান খেলা' নামে পরিচিত। ষোলো ঘুঁটির মতোই আরেকটি খেলা বত্রিশ ঘুঁটি। শুধু ঘুঁটির সংখ্যা প্রতিপক্ষে ৩২টি করে মোট ৬৪ টি। খেলার ছক থাকে আরো জটিল। তাই এ খেলা বয়স্করাই খেলে থাকে।

এলাডিং বেলাডিং: এলাডিং বেলাডিং খেলায় সীমানা ও দুটি দল থাকে। উভয় রাজা (দলনেতা) নিজ দলের লোকজন নিয়ে নিজ নিজ সীমানায় বসে থাকে। খেলোয়াড়েরা স্ব স্ব রাজাকে ঘিরে হাত-শিকল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছড়া বলে। রংপুরে আজও খেলাটির প্রচলন আছে। সেখানে 'এলাডিং বেলাডিং' নয়, 'এলাটিং বেলাটিং' এবং 'সইলোর' বদলে 'ধাইলো' বলা হয়।

চুড়ি ভাঙা: চুড়ি ভাঙা খেলার উপকরণ টুকরো টুকরো চুড়ি। গ্রামে মা-খালা, দাদি-নানি, ননদ-ভাবি একসময় হাতে কাচের চুড়ি পরতেন। নিত্য কাজ করতে গিয়ে মট মট করে ভেঙে যেত কাচের চুড়ি। কিশোরীরা এই ভাঙা চুড়ি সংগ্রহ করে রাখত। খেলার আগে এগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করা হয়। খেলোয়াড়রা ঘরের বারান্দা বা উঠোনে গোল হয়ে বসে। ডান বা বাম দিক থেকে দান ঘুরতে থাকে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। সাধারণত ডানহাতের মুঠোয় চুড়ির টুকরোগুলো নিয়ে সেগুলো ওপরের দিকে ছুড়ে মেরে ধরতে হয় হাতের উলটো পিঠে। এবার অন্যান্য খেলোয়াড় উলটো পিঠে টুকরোগুলো থাকা অবস্থায় যে-কোনো একটি টুকরো নির্দিষ্ট করবে। দানধারী খেলোয়াড়কে বলা হবে ওই নির্দিষ্ট টুকরোগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো ফেলে

দিতে। এভাবে একটি একটি করে টুকরো দখল হয় এবং খেলার উপকরণ কমতে থাকে। যে বেশি সংখ্যক টুকরো দখল করতে পারে সে এই খেলায় বিজয়ী হয়।

বুদ্ধিমন্তরঃ বুদ্ধিমন্তর খেলায় দৌড়ঝাঁপের বালাই নেই। যাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ম, তারা এই খেলায় ভালো করে। এটি দলভিত্তিক খেলা। তাই সবাইকে বুদ্ধিমান হতে হয়। প্রতিপক্ষ দুটি দল এবং একজন নিরপেক্ষ বিচারক থাকে। দু দলের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থান করে বিচারক। তার ডান ও বায়ে সমান দূরত্বে লাইন দিয়ে বসে উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক খেলোয়াড়। প্রথম পক্ষের একজন খেলোয়াড় যাবে বিচারকের কাছে। বিচারকের কানে কানে সে বলবে দ্বিতীয় পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড়ের নাম। এরপর দ্বিতীয় পক্ষের একজন খেলোয়াড় যাবে বিচারকের কাছে এবং প্রথম পক্ষের যে–কোনো একজন খেলোয়াড়ের নাম বলে আসবে কানে কানে। প্রথম পক্ষের খেলোয়াড় বিচারকের কাছে যার নাম বলে এসেছে, সেই যদি আবার বিচারকের কাছে প্রতিপক্ষের নাম বলতে আসে তাহলে ধরা পড়বে। তখন সে আর তার নিজের দলে ফিরতে পারবে না। বিচারকের সামনেই তাকে বসে থাকতে হবে। এভাবে খেলা চলতে থাকে। এক পক্ষের কেউ বাধা পড়লে অন্য পক্ষের বাধা পড়া খেলোয়াড় ছাড়া পায়।

লুডুঃ চার বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত লুডু খেলায় অংশ নিতে পারে। এটি ঘরোয়া খেলা। এই খেলায় ঝগড়াঝাঁটি হয় বেশি। স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ইনডোর গেমসে লুডু খেলা প্রতিযোগিতায় এখনো রাখা হয়। এটি একদিকে ধৈর্য, অন্যদিকে ভাগ্যের খেলা। লুডু খেলার জন্য বিশেষ কোটের প্রয়োজন হয়। এক পৃষ্ঠায় থাকে সাপ লুডু খেলার সুযোগ এবং অপর পৃষ্ঠায় কোট লুডু খেলার ব্যবস্থা। সাথে থাকে, ছয় পাশওয়ালা একটি ঘুঁটি। একবারে সর্বোচ্চ চারজন এ খেলায় অংশ নিতে পারে।

বাইরের খেলা

কানামাছি : 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ/যারে পাবি তারে ছোঁ' জনপ্রিয় এ ছড়াটি আজও গ্রামবাংলায় লোকমুখে শোনা যায়। খেলার মূল আকর্ষণ একজন অন্ধ বা কানা, যার চোখ গামছা বা অন্য কোনো কাপড় দিয়ে আঁটসাঁট করে বাঁধা হয়। অন্ধকে ঘিরে খেলোয়াড়রা দাঁড়িয়ে যায়। তারা অন্ধ সাজা খেলোয়াড়কে ঘুরে ফিরে সুযোগ মতো চিমটি কাটে। হাত বাড়িয়ে সে অন্য যে- কোনো একজন খেলোয়াড়কে ধরার চেষ্টা করে। কেবল ধরলেই হবে না, অন্ধকে বলতে হবে যাকে ধরল তার নাম। কানামাছি খেলা শিশু-কিশোরদের অনুভূতি শক্তি প্রখর করে। কানা যদি কাউকে ধরে তার নাম বলতে পারে তখনই সে রেহাই পায়। যার নাম সে বলবে, সে হয় পরবর্তীতে কানা। এভাবে চলতে থাকে কানামাছি খেলা। দলবদ্ধ এই খেলায় শিশু-কিশোর, কখনো কখনো কিশোরীরাও অংশ নেয়।

দাড়িয়াবান্ধা : দাঁড়িয়াবান্ধা গ্রামাঞ্চলের জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে শীতের বিকেলে গ্রামের ছেলেরা দল বেধে এই খেলায় মেতে ওঠে। গ্রামে ফসল কাটার পর প্রচুর জমি খালি পড়ে থাকে। সেই পতিত জমিতেই

লুডু খেলার ঘর

কোর্ট কেটে দাঁড়িয়াবান্ধা খেলা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে একদল থাকে আক্রমণকারী এবং অন্য দল রক্ষণকারী। আক্রমণকারী দলের কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে এবং ফাঁকি দিয়ে কোর্টের ঘরগুলো অতিক্রম করে যাওয়া। অন্যদিকে রক্ষণকারী দলের কাজ হচ্ছে তাদের প্রতিহত করা। রক্ষণকারীদের বলা হয় পাতিয়াল। আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড়রা পাতিয়ালদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যখন কোর্টের শুরু থেকে শেষের দিকে যেতে থাকে তখন তাদের বলা হয় কাঁচা খেলোয়াড়। যখন কোর্টের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করার পর আবার তারা ওপরে ফিরতে শুরু করে তখন তাদের বলা হয় 'পাকা খেলোয়াড়'। আক্রমণকারী দলের যে-কোনো একজন পাকা হয়ে পুনরায় শুরুর স্থানে ফিরে আসতে পারলে এক পয়েন্ট হবে। পাতিয়ালরা কাউকে ছুঁয়ে দিলে সে মরা। আক্রমণকারী দলের সবাই মরার আগ পর্যন্ত খেলবে। যে দলে বেশি পয়েন্ট জমবে, খেলায় তারাই জয়ী হবে।

কাঁঠাল চুরিঃ নরসিংদী জেলায় এই খেলাটির প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এটি মূলত অভিনয়ভিত্তিক খেলা। অংশ নিতে পারে আট বা দশ শিশু-কিশোর। খেলার শুরুতে হৃষ্টপুষ্ট একজন খেলোয়াড় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দুহাত মাথার তালুতে আটকে রেখে কনুই ভাঁজ করে সে কল্পিত কাঁঠাল গাছ সাজে। অন্য খেলোয়াড়রা কাঁঠাল গাছের কনুই ধরে ঝুলে পড়ে বা গাছরূপী খেলোয়াড়ের কোমরে বা হাঁটুতে পা ঠেকিয়ে ঝুলতে থাকে। অন্যদিকে চোর কাঁঠাল চুরির অপেক্ষায় থাকে। কাঁঠাল গাছের মালিক এসে কাঁঠালগুলো পেকেছে কিনা তা দেখে যায়। সে ঝুলে থাকা খেলোয়াড়দের গায়ে টোকা মেরে দেখে। সাংসারিক কাজে গাছের মালিক অন্যদিকে চলে যায়। এই সুযোগে ওতপেতে থাকা চোর কাঁঠাল চুরি করে ফেলে। একেক জন খেলোয়াড়কে কাঁঠাল হিসেবে গণ্য করে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এরপর দূরে নিয়ে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাখে। কাঁঠাল গাছের মালিক এসে দেখে গাছ ফাঁকা। সে হা-হুতাশ করতে থাকে। এ খেলার মূল আকর্ষণ হলো অভিনয়। এই খেলা শিশু-কিশোরদের অভিনয় শেখার সুযোগ করে দেয়।

ফ্যান্টাফ্যাসাঃ ফ্যান্টাফ্যাসা নামটি বিদেশি মনে হলেও খেলাটি একেবারে গাঁও গ্রামের। একাধিক খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে যায় ফ্যাণ্টফ্যাসা খেলতে। খেলোয়াড়দের সংখ্যা ৮ / ১০ বা তার বেশি হলে চমৎকার জমে ওঠে। প্রত্যেকের হাতে থাকবে কাগজ ও কলম। কাগজে নাম শ্রেণি ও রোল লেখা থাকে। খেলা পরিচালনার জন্য থাকে একজন রেফারি। সে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য একটি চিরকুট তৈরি করে। চিরকুটে লেখা থাকে বিভিন্ন

দাড়িয়াবান্ধা

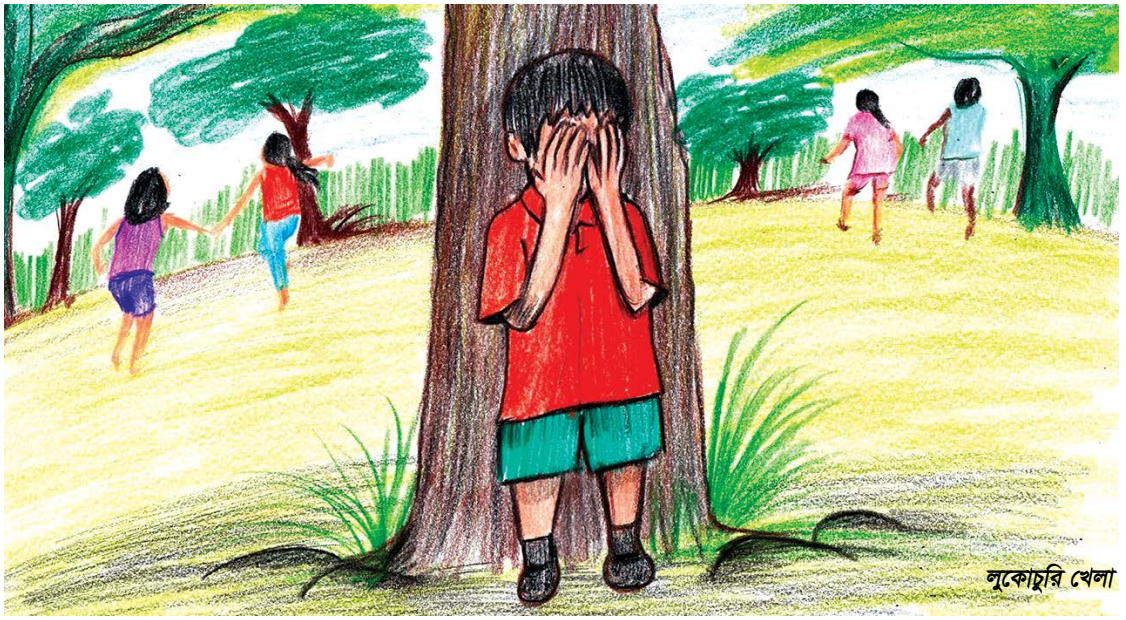

লুকোচুরি খেলা

ফল, ফুল, পাতা, পাখি, নদী, দেশ প্রভৃতির নাম। এই চিরকুটটি আলপিন বা সেফটিপিন দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয় প্রত্যেক খেলোয়াড়ের শার্ট বা গেঞ্জিতে। প্রত্যেকের পেছনে এসব চিরকুট সেঁটে দেওয়ার সময় খেয়াল রাখা হয়, অন্য কেউ যেন দেখতে না পায় কি লেখা আছে। এরপর মূল খেলা শুরু হয়। হাতে কাগজ-কলম নিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায় সবাই। বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। সবাই যার যার সাধ্যমতো হেলে দুলে দ্রুত ঘোরার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পেছনের চিরকুটে কি লেখা আছে তা যেন তার পেছনের খেলোয়াড় সহজে দেখতে না পারে। নির্ধারিত সময় পার হলেই বেজে ওঠে রেফারির বাঁশি। থেমে যায় ঘোরাঘুরি। সবাই যার যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে যায়। যে খেলোয়াড় তার আশপাশের খেলোয়াড়ের পিঠে লেখা চিরকুট দেখে নিজের কাগজে সবচেয়ে বেশি নাম লিখতে পারে সে প্রথম হয়।

লুকোচুরিঃ গ্রামাঞ্চলের বেশ জনপ্রিয় খেলা লুকোচুরি বা পলাপলি। খেলায় দুটি দল থাকলেও একটি দলে থাকে মাত্র একজন খেলোয়াড়। বাকি সবাই অন্য দলে। খেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি থাকে। এই গণ্ডি বেশ বড়ো এলাকা নিয়ে হয়। কোনো ছক কাটা না থাকলেও বলা হয় নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া যাবে না। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত বলা হয় অমুক অমুকের বাড়ির বাইরে গেলে পচা। একজন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয় যে সব খেলোয়াড়কে খুঁজে বের করবে। খোঁজারু এই খেলোয়াড় এক থেকে একশ বা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত গুণতে থাকে। এ সময় তার চোখ বাঁধা হতে পারে বা সে একটি নির্দিষ্ট দিক ফিরে থাকবে। গণনা চলতে চলতে খেলোয়াড়রা যে যার মতো লুকিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় খোঁজারু খেলোয়াড়ের কঠিন পরীক্ষা। সে সর্বপ্রথম যে খেলোয়াড়কে দেখবে তখনই উচ্চারণ করবে 'টিলো'। দেখার আগেই লুকানো কেউ এসে ছুঁয়ে দিলে আবারও খোঁজারু হতে হবে তাকে। তবে সে সবাইকে খুঁজে পেলে যাকে প্রথম দেখেছে, সেই পরবর্তীতে খোঁজারু হবে।

ইচিং বিচিংঃ চপলা চঞ্চলা কিশোরীদের মধ্যে গ্রামবাংলায় আজও বেশ জনপ্রিয় খেলা ইচিং বিচিং। এই খেলায় শারীরিক কসরত বেশি। সঙ্গে চালাকি আর ছড়া। এই খেলায় কোনো দল থাকে না। সবাই সবার প্রতিপক্ষ। দশ বা ততোধিক খেলোয়াড় হলে খেলা হয় জমজমাট। যার শুরু হয় হাত ভাঙানো দিয়ে। অর্থাৎ তিনজন খেলোয়াড়কে উপুড় বা চিৎ করে নিজের একটি হাত পাততে হয়। যতক্ষণ তিনজনের যে-কোনো দুজনের হাত একজনের বিপরীত অবস্থায় না পড়ে ততক্ষণ এমনটা চলতে থাকে। দুজনের চেয়ে

ইচিং বিচিং খেলা

ভিন্ন অবস্থায় যার হাতটি পড়ে সে 'ওঠা', মানে বাছাই পেরোনো। এভাবে শেষে যে দুজন থাকে, তারা চোর। দুই চোরকে সামনের দিকে বসতে হয় পা ছড়িয়ে। প্রত্যেকের পায়ের পাতা মিশতে হবে একটি অপরটির সঙ্গে। তারা পায়ের ওপর পা এবং পরে হাত দিয়ে বাধা তৈরি করে। মুখে ছড়া কেটে একদমে লাফ দিয়ে তা ডিঙাতে হয় অন্যদের। সবচেয়ে প্রচলিত ছড়াটি হচ্ছে-'ইচিং বিচিং চিচিং ছা/প্রজাপতি উড়ে যা।' তখন চোরের পায়ের সঙ্গে কারও ছোঁয়া লাগলে তাকে সাজতে হবে চোর। আর যার হাত বা পায় সে স্পর্শ করে, সে চোর অপবাদ থেকে রেহাই পায়।

পানির খেলা

ডুব সাঁতার : বর্ষাকালে নদী-নালা, খাল-বিলে গোসলের অজুহাতে ছোটো ছেলেমেয়েরা ডুবসাঁতারে মাতে। সাধারণত তিন ধরনের ডুব দেওয়া হয়। এক ধরনের খেলা হচ্ছে, ডুব দিয়ে দীর্ঘ সময় পানির নিচে থাকা। আরেক ধরনের খেলা হচ্ছে, গভীর পানির তলদেশ থেকে কাদা তুলে আনা। এ ছাড়া রয়েছে ডুব দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার প্রতিযোগিতা। ডুবসাঁতারে জয়ী হতে অনেকক্ষণ দম রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হয়। এ ছাড়া উপুড় সাঁতার ও চিৎ সাঁতারেরও নানা খেলা আছে।

আবুর মার টাবুর টুবুর: এই খেলার উপকরণ হচ্ছে কচুরিপানা। তিন বা ততোধিক খেলোয়াড় বৃত্তাকারে বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে যায়। একজন খেলোয়াড় মাথায় নেয় কচুরিপানা।

অন্যরা তখন জিজ্ঞেস করে:

কাউয়ারে কাউয়া তোর মাথাত কি? জবাব আসে, বগার ডিম।

আবার জানতে চায়, পানিত ফালাইলে ভাসব? জবাব আসে, ভাসব।

ছড়া কাটা শেষ হওয়া মাত্র মাথা নেড়ে কচুরিপানা ফেলে দেওয়া হয় পানিতে। তখন সব খেলোয়াড়ই এক সঙ্গে পানিতে জোরে জোরে থাপ্পড় দেয়, পানিতে ফেনা ওঠে। এরই মধ্যে হারিয়ে যায় কচুরিপানা। পানিতে ফেনা তোলার সময় খেলোয়াড়েরা বলতে থাকে 'আবুর মার টাবুর টুবুর'। কচুরি পানাটিকে বকের ডিম কল্পনা করে চলে খেলা। যার হাতে এই কচুরিপানা স্পর্শ করে, তাকে তাৎক্ষণিক ডুব দিতে হয়। আর যদি সে তা না করে তাহলে খেতে হয় অন্যের কিল-থাপ্পড়। তাই হাতে কচুরিপানা স্পর্শ করামাত্র সেটি নিয়ে ডুব দেয় খেলোয়াড়। এরপর ভেসে উঠে কচুরিপানা দেখালে মাফ পাওয়া যায়।

লৌকিক খেলাধুলার গণ্ডি এতই বিস্তৃত যে, সেগুলোকে পরিসংখ্যানে আবদ্ধ করা এক প্রকার অসম্ভব। শৈশব-

কৈশোরে লৌকিক খেলাধুলার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বেশ সমৃদ্ধ।

নগর বৃত্তের বাইরে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এসব খেলা। আমরা আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিমুখ নই। পুরোনোকে পুরোপুরি আঁকড়ে থাকতে চাই না। তাই বলে লৌকিক খেলাধুলা এভাবে হারিয়ে যাবে এটাও কাম্য নয়। ■

খেলাধুলার গুরুত্ব

মো. রেজুয়ান খান

শরীর ও মন গঠনের এক অন্যতম উৎস খেলাধুলা। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত-পরিমিত খেলাধুলা শরীর সতেজ রাখে এবং মনকে প্রফুল্ল রাখে। কাজেই দেহের যত্নের জন্য খেলা আর মনের খোরাক জোগাতে গানবাজনা, হাসি-আনন্দ সবই অনুশীলন বা পরিচর্যা করা প্রয়োজন। খেলাধুলা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না, আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সরল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গে সমীপবর্তী হইবে।'

দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন ভালো না থাকলে তার প্রতিক্রিয়া দেহে পড়ে। আবার শরীর ভালো না থাকলে মন খারাপ থাকে। খেলাধুলাই একমাত্র মাধ্যম যা আমাদের দেহ ও মনকে ভালো রাখে। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলা চালিয়ে যাওয়া দরকার। এছাড়া নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, সুন্দর চরিত্র গঠনেও খেলাধুলার গুরুত্ব অনেক। খেলাধুলা থেকে সময়ানুবর্তিতা, হাল ছেড়ে না দিয়ে এগিয়ে যাওয়া, দলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা এবং যে-কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শিক্ষা পাওয়া যায়। জীবন চলার পথে জয় ও পরাজয় আছে। খেলাধুলায় বীরদের জয় যেমন সাফল্য ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, অন্যভাবে বিজিতের পরাজয়-গ্লানিকে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলার মানসিকতাকে প্রস্তুত করে। মানুষের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে খেলাধুলার মাধ্যমে। খেলাধুলা পরস্পরের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। খেলাধুলা সকলকে এক পতাকা তলে নিয়ে আসে। এভাবেই প্রত্যেকের মনের মধ্যে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ।

সময়োপযোগী বিকেএসপি আইন-২০২০

বর্তমান সময়ের ছাত্রসমাজকে শারীরিক অনুশীলনযুক্ত খেলাধুলার পরিবর্তে ভার্চুয়াল তথা অনলাইন ভিডিও গেইম, কম্পিউটার ও মোবাইল গেইম ইত্যাদি খেলাধুলা নিয়ে মত্ত থাকতে দেখা যায়।

ভার্চুয়াল খেলাধুলা সুস্বাস্থ্য বয়ে আনে না বরং এ ধরনের শারীরিক কসরতবিহীন আধুনিক খেলাধুলা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ছাত্রসমাজের মনোবিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যহীন লোক জীবনে কিছু করতে পারে না।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার শারীরিক কসরতযুক্ত খেলাধুলায় ছাত্রসমাজকে উৎসাহ প্রদানে বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। ফলশ্রুতিতে দেশীয় খেলাধুলাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুনভাবে সময়োপযোগী আইন-২০২০ প্রণয়ন করেছে। নতুন আইনে বাংলাদেশের এক সময়কার জনপ্রিয় এমন ৫০টি খেলাধুলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার গুরুত্বকে অনুধাবন করেই এ আইনে অটিস্টিকসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলার জন্য পৃথক ইউনিট গঠন করেছে। এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশের অটিস্টিক খেলোয়াড়রা বিশ্বের বিভিন্ন বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জয়ী হয়ে দেশের সুনাম বয়ে আনছে।

এছাড়া সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন ।- ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, শ্যুটিং, অ্যাথলেটিক্স, দাবা, সাঁতার, ভলিবল ও গলফ -এ ধরনের খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ সচেষ্ট রয়েছে বর্তমান সরকার। সরকার জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড়দের আলাদা বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখে খেলাধুলার গুরুত্বকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে খেলোয়াড়রা একদিকে যেমন উৎসাহিত হচ্ছে সেই সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় দেশের সুনাম ও গৌরব বয়ে আনছে। ■

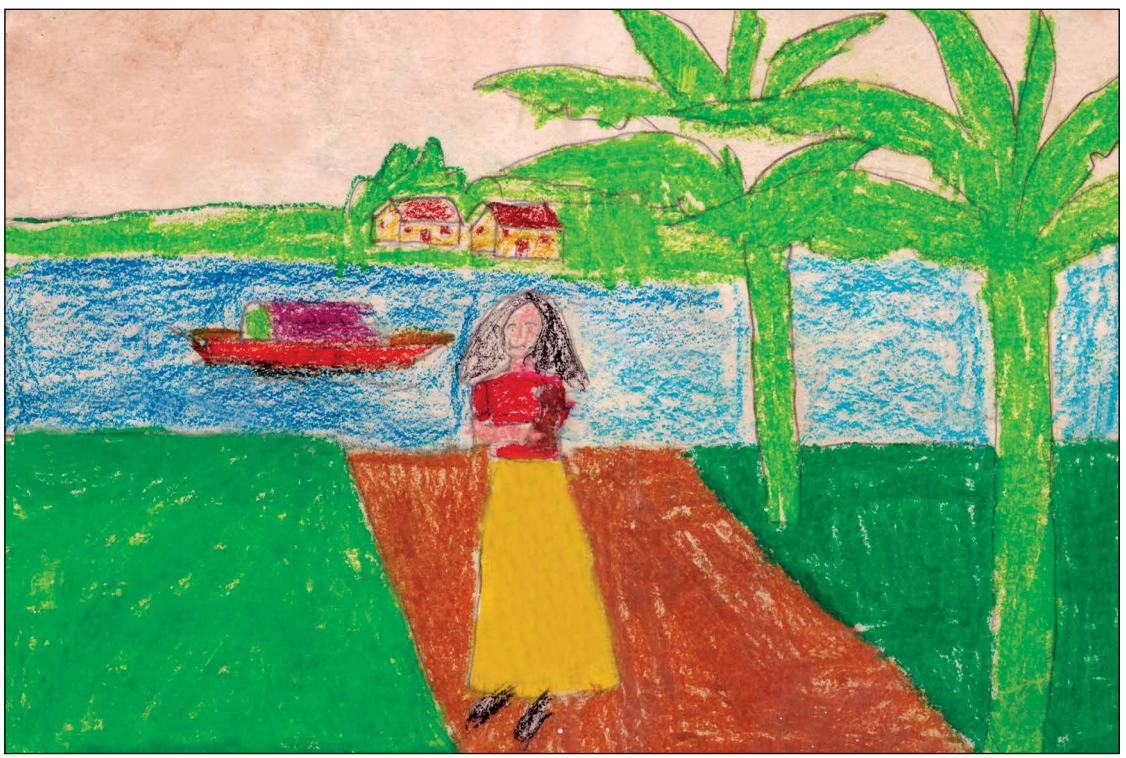

ইরিনা হক, ৫ম শ্রেণি, ই এস এস স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

গ্রামের অধিকাংশ খেলার সঙ্গে রয়েছে ছন্দ বা ছড়ার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র, যা খেলোয়াড়দের দেহ ও মন চাঙা করে। এসব খেলার মূল আকর্ষণই হচ্ছে আঞ্চলিক ছড়া। যেমন-'কানামাছি ভোঁ ভোঁ/যাকে পাবি তাকে ছোঁ'।

কোনো বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক বা খেলোয়াড় এসব ছড়া সৃষ্টি করেননি। তারপরও এসব ছড়ার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের লোকসাহিত্য। বংশপরম্পরায় শুনে শুনে এসব ছড়া টিকে আছে। কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আবার একেক অঞ্চলে একই খেলার সঙ্গে বিভিন্ন ছড়া প্রচলিত।

ছড়াই গ্রামীণ খেলার প্রাণ

শাহ্‌রিয়ার শরিফ

গ্রামীণ প্রায় সব খেলার সঙ্গে ছড়ার কমবেশি যোগসূত্র আছে। তবে কিছু কিছু খেলা আছে যেগুলো ছড়া বাদে চিন্তা করা যায় না। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: দ্রুত উচ্চারণ কসরত, গোটন/খুটনা, চোখের পাতায় ফুঁ দেওয়া, চিমটি কাটা, হাঁটি হাঁটি পা পা, ধাঁধার খেলা, কথার হার-জিৎ, ঘঙ্গি লো ঘঙ্গি ও আগডুম বাগডুম, চিলি ও হাঁসহাঁস এবং ব্যাঙ লাফানো ইত্যাদি।

বুড়ির চি/বৌ-চি

গ্রামের কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে এক সময়ের জনপ্রিয় প্রাচীন খেলা বুড়ির চি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। যদিও এটি দৌড়ঝাঁপ ও লাফালাফি খেলা। খেলাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে অন্তত ডজনখানেক ছড়া।

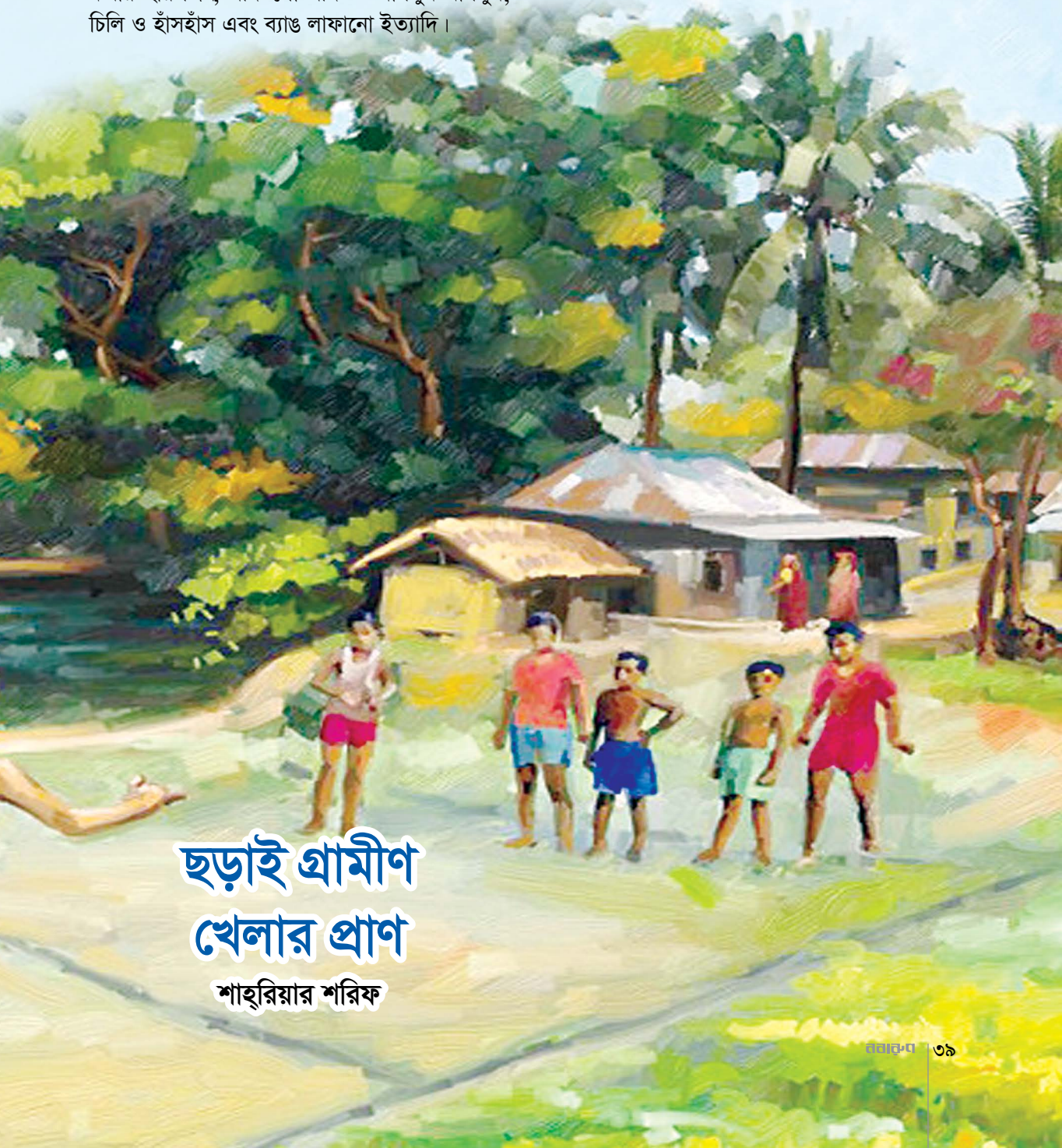

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই খেলার বিভিন্ন নাম রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে নাম চি হি, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ছি ধরা, ঢাকা অঞ্চলে ছি-রানি, নোয়াখালী অঞ্চলে খুম, বরিশাল অঞ্চলে বউ গোলা, খুলনা অঞ্চলে বুড়ির চি প্রভৃতি নামে খেলাটি পরিচিত। সর্বত্র খেলার ধরন প্রায় একই। তবে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের আঞ্চলিক ছড়ার যোগসূত্র রয়েছে।

খুলনা অঞ্চলে যেসব ছড়ার প্রচলন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

১. হায় কিত কিত তারে নারে/ঘুঘু ডাকে বারে বারে

২. কলার পাতায় কেউচি/বউ নিতে আইছি

৩. আমড়া গাছে কাকের ঘু

৪. বাড়ির ধারে কুটোর পালা/বউ নিতে কত জ্বালা

৫. কিত কিত কিত হেইয়া বাবুলের মাইয়া,
বাবুল কান্দে কাঁচা কলা খাইয়া।

ঢাকা অঞ্চলের একটি ছড়া হচ্ছে–

আমি যামু আহাশে/জল খামু গিলাসে
নীল আহাশ/সদ বাতাস
রাইতে তারা/আহাশ ভরা
তারায় তারায় যামু রে/পানি পান্তা খামুরে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি ছড়া হচ্ছে–

এই কালাচান্দের মাটি/সেলাম কইরা হাঁটি
যদি মাটি লরে/কিল খাইয়া মরে।

ঘুড়ি ওড়ানো

গ্রামবাংলার অসম্ভব জনপ্রিয় খেলা ঘুড়ি ওড়ানো। আমাদের ঘুড়ি ওড়ানো খেলা আজ পরিণত হয়েছে ঘুড়ি উৎসবে। আজও গাঁ-গঞ্জে ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। করোনাকালে খেলাটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমেজ ধরে রেখেছে।

খেলাটি কোনো কোনো অঞ্চলে ঘুড্ডির খেলা বা চিলে ওড়ানো নামেও পরিচিত। কার ঘুড়ি কত উঁচুতে উঠতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠত ঘুড়ির মালিক। দৃষ্টিসীমার বাইরে ঘুড়ি চলে গেলে কিশোররা বেশি আনন্দ পেত। ছড়া কাটা হতো এই বলে-

‘চিলা করে ঢিলাঢিলা
কয়রা করে টান
ধাউস ঘুন্নি উঠ্যা বলে
আরও সুতা আন।’

ঘুড়ি ওড়ানোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল কাটাকাটি খেলা। অর্থাৎ একজনের ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে অন্যের ঘুড়ির সুতোয় প্যাঁচ লাগিয়ে কেটে দিতে পারলে আনন্দ ও গর্বের শেষ ছিল না। ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা দিতে কাচ গুঁড়া করে তা ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে সুতোয় মেখে দিত। ফলে সুতো হয়ে উঠত ধারালো। যার সুতোয় ধার বেশি হতো সে-ই কাটাকাটি খেলায় সফল। সুতো কাটাকাটি খেলার সময় ছড়া কাটা হতো। এর একটি হচ্ছে-

‘ঘুড়ি ওড়াব লাটুই নিব
সঙ্গে যাবে জাদু
প্যাঁচ লাগাব, ঘুড়ি কাটব
হেরে যাবে কাদু।’

ডুবাডুবি

বর্ষাকালে নদীনালা, পুকুর ও জলাশয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ডুবাডুবি খেলা হতো। প্রথমে পানিতে দুরন্ত কিশোররা সারি বেধে দাঁড়ায়। তারপর হাঁটুতে ও পরে কোমরে দু-হাত রেখে ছড়া কাটে–

এতটুকু পানি, জাক্কের জানি
এতটুকু জল, জলের তলে চল।

অনেকক্ষণ ডোবাডুবির পর যে বা যারা আগে ডাঙায় উঠে পড়ে, তাদের উদ্দেশ্যে পানিতে ডোবাডুবি করা ছেলে-মেয়েরা বলত: ‘হাইরা গেল কুত্তি, নাকে দিমু গুত্তি।’

উবু দুবু

উবু দুবু মূলত মেয়েদের খেলা। যে–কোনো সংখ্যক খেলোয়াড়ই উবু দুবু খেলতে পারে। তবে পাঁচ-ছয় জন হলে খেলা বেশ জমে ওঠে। খেলার উপকরণ খেলোয়াড়দের হাতের দশ আঙুল। পুরো খেলাটার সঙ্গে রয়েছে ছড়ার যোগসূত্র।

জোলাভাতি খেলা

দোকান দোকান খেলা

প্রথমে একজন রাজা নির্বাচন করা হয়। সে-ই খেলা পরিচালনা করে। অন্যরা হাত উপুড় করে দশ আঙুল মাটিতে ছড়িয়ে বসে। রাজা দশ লাইনের একটি ছড়ার প্রতিশব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একেকটি আঙুল গণনা করে। ছড়াটি হচ্ছে-

'উবু দুবু দোতলা বাড়ি
কাক ডাকে সারি সারি
জাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল এনে দাও খেলা করি
পুতুলের মাথায় কোঁকড়া চুল
বেঁধে দেবো গোলাপ ফুল।
ও গোলাপ ফুলে আয়না
তোকে দেবো গয়না
আমি খাব মিষ্টি পান
তোকে দেবো শুঁটকো পান।'

রাজা যখন উচ্চারণ করে 'উবু' তখনই একটি আঙুল, যখন বলে 'দুবু' তখন আরেকটি আঙুল গোনা হয়। এভাবে প্রতিটি শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে গোনা হয় একেকটি আঙুল। ছড়ার ষষ্ঠ লাইনে 'ফুল' এবং দশম লাইনে 'পান' বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'বার থামতে হয়। ফুল বললে একটি আঙুল ভাঁজ হবে এবং পান বললে ভাঁজ হবে আরেকটি আঙুল। ষষ্ঠ লাইনে গোলাপ বলার পর 'ফুল' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একটি আঙুল ভাঁজ করা হয় বড়শির মতো। সেটিকে বাদ দিয়ে আবারও গোনা চলতে থাকে। শেষ লাইনে শুঁটকো বলে 'পান' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি আঙুল ভাঁজ হয়ে যায়। অর্থাৎ 'ফুল' ও 'পান' যে আঙুলে পৌঁছে উচ্চারণ করা হবে সেই আঙুলটিই সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ হবে। এভাবে একে একে যার এক হাতের পাঁচ আঙুলই ভাঁজ হয়ে যায় সেই হাতটি ওঠে। যার দু-হাত আগে ওঠে সেই প্রথম বিজয়ী। যে হেরে যায় তাকে খ্যাপানোর শ্লোক হচ্ছে 'হেরে গেছে হারানি, দত্তের গুবারানি'।

পলাপলি/লুকোচুরি

অঞ্চলভেদে পলাপলি খেলার রয়েছে বিভিন্ন নাম পৃথক পৃথক নিয়ম। নোয়াখালী অঞ্চলে এই খেলার নাম চোখপলানি, ময়মনসিংহ অঞ্চলে তালাতালি এবং খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলে এই খেলা পলাপলি নামেই পরিচিত। খেলাটির বিদেশি সংস্করণ হচ্ছে 'হাইড অ্যান্ড সিক'। ঐতিহ্যবাহী এই খেলার প্রচলন অতীতে ছিল রাজ অন্তঃপুরে।

প্রথমেই একজনের 'চোর' হওয়ার অপবাদ যার ভাগ্যে জোটে, তা ঘোচাতে তাকে লুকিয়ে থাকা অন্য খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে হয়। তার আগে এই চোর নির্ধারণের জন্য আবার লটারির মাধ্যমে বা আপসে নির্বাচিত হয় রাজা। নিজের হাত পেছনে নিয়ে রাজা গোপনে একটি আঙুল ফোটায় এবং যে ফোটানো আঙুলটি ধরবে সেই হবে চোর। তবে কোন আঙুলটি ফোটানো তা রাজা ছাড়া আর কেউ জানবে না। খেলোয়াড়দের ডাকার জন্য আঙুল ফুটিয়ে রাজা বলতে থাকে 'জুড়ে গেলে পাবে না/জুড়ে গেলে পাবে না'।

এরপর রাজা একে একে আঙুল ধরা সব খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। খেলোয়াড়ের কাছে সে সুরের ভঙ্গিতে জানতে চায়-

'এতটুক কী?'
খেলোয়াড়ের জবাব-'নুন'।
আবার রাজার প্রশ্ন-'এতটুক কী?'
খেলোয়াড়ের জবাব-'রুটি'।
তখন রাজা বলে-'তোমার আজ ছুটি'।

ছুটি বলা খেলোয়াড় আঙুল ছেড়ে দেয়। এভাবে সকলকে প্রশ্ন করা হয় এবং ছেড়ে দেওয়া হয়। ফুটানো আঙুল যে ধরে তার রেহাই নেই। তাকে রাজা জিজ্ঞেস করে-

'এতটুক কী?'
খেলোয়াড় বলে 'নুন',
তখনই রাজা বলে উঠে-'তুমি আজ খুন।'

অর্থাৎ ওই খেলোয়াড়কে সাজতে হয় চোর। রাজা তখন চোর হওয়া খেলোয়াড়ের চোখ ধরে। এমনভাবে চোখ ধরা হয় যাতে সে কিছুই না দেখতে পারে। এরপর রাজা এক থেকে পঞ্চাশ বা একশ পর্যন্ত জোরে জোরে উচ্চারণ করে। খেলোয়াড়দের এই সময়ের মধ্যে পালাতে হবে। তারা এমনভাবে পালায় যাতে চোর খুঁজে না পায়। যখন পঞ্চাশ বা একশ পর্যন্ত গোনা প্রায় শেষ তখন লুকিয়ে থাকা খেলোয়াড়েরা মুখে উচ্চারণ করে 'কু-উ-উ-ক'। এরপর ছেড়ে দেওয়া হয় চোখ। বেচারা চোর তখন চোখ ডলতে ডলতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নেয়। শুরু হয় তার খোঁজাখুঁজি।

কোনো কোনো অঞ্চলে রাজা ও চোর নির্বাচিত হবার পর একটি ছড়া কাটা হয়। ছড়াটি হচ্ছে-

'ইন বিন সাড়ে তিন
জবকা রুটি ক্যালার ডিম
হাড় গোড় পিত পোড়
ইন্না রাজা বিন্না চোর।'

দ্রুত উচ্চারণ কসরত

গ্রামে যে শিশু দ্রুত কথা বলে তাকে ব্যঙ্গ করে তোতা পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এমনও বলা হয়, 'ওর কথায় যেন খই ফোটে' বা 'ও তড়বড় করে কথা বলে'।

এটি একটি খেলা। এর নাম হচ্ছে দ্রুত উচ্চারণ কসরত খেলা। এই খেলার মাধ্যমে জিহ্বার জড়তা কাটে, নির্ভুলভাবে কথা বলতে শেখে শিশু-কিশোররা। দেশের একেক অঞ্চলে দ্রুত কথা বলার জন্য একেক ধরনের ছড়া বা বাক্য ব্যবহার করা হয়।

যেমন- খুলনা অঞ্চলে দ্রুত উচ্চারণ কসরত হিসেবে বলা হয়: 'পাখি পাকা পেঁপে খায়'। কয়েকবার পর পর দ্রুত বলতে গেলে খেলোয়াড়রা বলে-'পাখি পাপা পেঁপে খায়'। আরেকটি হলো-'কাঁচা গাব পাকা গাব।' দ্রুত বলতে বলতে এটি বিকৃত হয়ে মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়-'কাঁচা বাপ পাকা বাপ'। গাবকে 'বাপ' বললে হাসির রোল পড়ে যায়।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি ছড়া হচ্ছে-

'আমড়া গাছ অবাইন্ধা দামড়া
সেই আমড়া খাই আমরা।'

দ্রুত কয়েকবার বলার সময় 'আমরা' স্থলে 'দামড়া' উচ্চারণ হবেই।

দেশের কয়েকটি অঞ্চলে প্রচলিত আরেকটি ছড়া হলো-

উইড়া যায় রে বকটা
দে গো মা টাকটা (বক মারার ফাঁদ)
মাইরা আনি বকটা।

ছড়াটিতে রয়েছে শব্দের বাহুল্য। এ জন্য দ্রুত উচ্চারণের সময় শব্দের হেরফের ঘটে।

আরেকটি ছড়া হলো-

গু-এর টোপা থুই
ঘি-এর টোপা খাই।

ছড়াটি কাটতে কাটতে ঘি-এর বদলে 'গু' উচ্চারণ করলেই পরাজয়।

কথায় হার-জিৎ খেলা চলে এমন আরেকটি ছড়া হচ্ছে-

এক কথা। ব্যাঙের মাথা।
কী ব্যাঙ? ছাও ব্যাঙ।
কী ছাও? গু খাও।

এভাবে ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে কথায় হার- জিৎ খেলা। দুজনের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চলে এই খেলা। আরেকটি ছড়া হচ্ছে-

এক কথা। কী কথা?
ব্যাঙের মাথা। কী ব্যাঙ?
তরু ব্যাঙ। কী তরু?
নীল তরু। কী নীল?
লাল গিল।

গোটন/খুটনা

ছড়ার সঙ্গে গোটন খেলার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। অঞ্চলভেদে এই খেলার নাম খুটনা, গোটন। খেলার উপকরণ পাঁচটি ইট, পাথর বা কাঠের টুকরো। গ্রামের কিশোরী বা তরুণীরা মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে গোল হয়ে বসে। এরপর শুরু হয় ছন্দের তালে তালে গোটান খেলা।

একাধিক খেলোয়াড় গোটন খেলতে পারে। সবাই চায় আগে দান মারতে। তবে যার হাতে ঘুঁটি থাকে সেই প্রথম দান মারার সুযোগ পায়। যে ছন্দের তালে তালে ঘুঁটি ওঠানো বা নামানো হয় সেটি হচ্ছে–

ও ফুল ও ফুল ও ফুল-দোগো
ও দোগো ও দোগো-তেগো
ও তেগো-কুড়ে
ও কুড়ে ও কুড়ে ও কুড়ে-জুড়ে
এক গুটিলাম জোড় তুললাম লটে
ও লটে ও লটে ও লটে-পেটে
ও পেটে ও পেটে ও পেটে-মাখম
ও মাখম ও মাখম ও মাখম-রঙ্গন
ও রঙ্গন ও রঙ্গন ও রঙ্গন-বল্লভ
ও বল্লভ ও বল্লভ ও বল্লভ গাছ
ও গাছ তুমি বস পথে ও গাছ তুমি ওঠো হাতে-ঠুক্কুস।

ছড়ার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুঁটি ওঠানো বা নামানোর ব্যাপার থাকে। খেলার প্রথমে পাঁচ ঘুঁটি মাটিতে ফেলতে হয়। খেয়াল রাখা হয় যেন কড়িগুলো ফাঁকা ফাঁকা থাকে। এরপর যে-কোনো একটি ঘুঁটি হাতে তুলতে হয়। মুখে বলতে হয় ফুল ও ফুল ও ফুল দোগো। প্রতিবার 'ফুল' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঘুঁটি তুলতে হয়।

এ খেলার নিয়ম রয়েছে। প্রথমে তোলা ঘুঁটিটি উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে নিচ থেকে একটি ঘুঁটি তুলে আবার ওপরে ছুড়ে দেওয়া ঘুঁটিটি ধরতে হয়। দোগো খেলার সময় একইভাবে হাতের ঘুঁটিটি ওপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে দুই ঘুঁটি একত্রে মাটি থেকে তুলে আবার ওপরে ছুড়ে দেওয়া ঘুঁটিটি ধরতে হবে।

এভাবে তেগো খেলার সময় একত্রে তিনটি, কুড়ে খেলার সময় একটি, জুড়ে খেলার সময় প্রথমে একটি ও পরে দুটি লটে খেলার সময় একটি করে, পেটে খেলার সময় একটি করে, মাখন খেলার সময় একটি করে, রঙন খেলার সময় একটি করে ঘুঁটি তুলতে হয়।

ফুল থেকে রঙন খেলা পর্যন্ত যে–কোনো পর্যায়ে ঘুঁটি হাত থেকে পড়ে গেলে দান অন্যের হাতে চলে যাবে। তবে যেখান থেকে দান যাবে পরবর্তীতে সেখান থেকেই খেলতে হবে। কিন্তু রঙনের পর বল্লভ খেলার সময় যদি ঘুঁটি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে পুরো দানই নষ্ট হয়ে যাবে। পরে নতুন করে অর্থাৎ ফুল থেকে খেলা শুরু করতে হয়। এজন্য বল্লভ খেলার সময় অন্যান্য খেলোয়াড়রা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, 'বল্লভ পচা ফুল'।

সাফল্যের সঙ্গে বল্লভ খেলার পর পাঁচ ঘুঁটি মাটিতে ফেলতে হয়। একটি একটি করে তোলার পর যে দান খেলতে হয় তার নাম 'গাছ'। বিশেষ কায়দায় দুটি ঘুঁটি একত্রে ওঠানো এবং মাটিতে বসানো এবং পরে সবগুলো ঘুঁটি হাতে তোলার মাধ্যমে গাছ খেলা শেষ হয়। এরপর এক হাতের মুঠোয় সবগুলো ঘুঁটি নিয়ে একটি ওপরে ছুড়ে আবার বাকি চারটির সঙ্গে মেলাতে হয়। ওপর থেকে ঘুঁটি যখন হাতে থাকা ঘুঁটিগুলোর ওপর এসে ধাক্কা খায় তখন যে শব্দ হয় তার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড় মুখে উচ্চারণ করে 'ঠুক্কুস'।

সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে হাত পৃষ্ঠা। অর্থাৎ পাঁচ ঘুঁটি হাতের মুঠে নিয়ে ঘুঁটিগুলো ওপরে ছুড়ে মুহূর্তে হাতের উলটো পিঠে সবগুলো ধরতে হবে। আর তা পারলেই খেলোয়াড়ের ডান পাশে যে থাকবে তার ঘাড়ে এক গোলের দায় চাপবে। এরপর বাকি খেলোয়াড়রা খেলতে থাকবে। একে একে সবাই খেলার শেষ ধাপ অর্থাৎ হাত পৃষ্ঠা অতিক্রম করবে। প্রথম সফল খেলোয়াড় তার ডান পাশের খেলোয়াড়কে ঋণী করে। এভাবে প্রত্যেকে তার ডান পাশের খেলোয়াড়কে ঋণী করে বিদায় নেয়। যে সর্বশেষ খেলোয়াড় থাকে সবাই মিলে তাকে খ্যাপায়। খ্যাপানোর শ্লোক হচ্ছে-'ঘাড়ে খেয়ে বাড়ি যায়, ব্যাঙ পোড়া দিয়ে ভাত খায়।'

চোখের পাতায় ফুঁ

চোখের পাতায় ফুঁ দেওয়ার খেলাটি শিশুদের ভয় ভাঙানোর জন্য প্রচলিত হয়েছে। শুরুতে ছেলে-মেয়েরা সারি দিয়ে চোখ খুলে দাঁড়ায় এবং একজন ছড়া আবৃত্তি করতে করতে এক এক করে সবার চোখে ফুঁ দেয়, সাহস পরীক্ষা করে। ফুঁ দেওয়ার সময় যে চোখ বন্ধ না করে থাকতে পারে, সে-ই সবার চেয়ে বেশি সাহসী বলে বিবেচিত হয়। এই খেলার ছড়ার একটি নমুনা দেওয়া হলো-

টেং টেং শুবারী
মধুর বাপের কাচারি।
মধুর বাপের খেড়িডা
ফাল দা উঠে বুড়ি ডা।
ও বুড়ি কই যাছ?
নাতিন বাড়িত।
নাতিন বাড়িত কে রে?
বাঘ মহিষের ডরে! (মোমেনশাহী)

খেলায় যতজন শিশু অংশগ্রহণ করে খেলার পরিচালক এক এক করে প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে ছড়াটি আবৃত্তি করে এবং ছড়ার শেষ কলি 'বাঘ মইষের ডরে' আবৃত্তি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একজনের চোখে ফুঁ দেয়। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকে।

চিমটি কাটা খেলা

চিমটি কাটা ধৈর্যের খেলা। খেলাটির শুরুতে ১০/১৫ জন ছেলে-মেয়ে হাত উপুড় করে বৃত্তাকারে বসে থাকে। একজন ছেলে অথবা মেয়ে এক এক করে প্রত্যেকের হাতের চামড়ায় চিমটি কেটে বলে উঠে- 'টান না ঢিল?' যদি 'ঢিল' বলে, তখন চিমটিটি আরো শক্ত করে ধরে পুনরায় জিজ্ঞেস করে 'টান না ঢিল'? এইভাবে তিন থেকে পাঁচবার পর্যন্ত চিমটি কাটা হয়। একটি খেলোয়াড় প্রত্যেকবারই যদি ঢিল বলে তখন সে এই খেলায় জয়লাভ করে। আর খেলোয়াড়টি চিমটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে যদি বলে ফেলে 'টান' তখন সে পরাজিত হয়। এ খেলায় অনেকের চোখ দিয়ে পানি বের হয়, এমনকি অনেকে কেঁদেও ফেলে, তবু টান

কথাটি বলতে চায় না। খেলাটিতে অনেক সময় ছড়া ব্যবহার করতেও দেখা যায়। ছড়ার মাধ্যমে এ খেলার প্রকৃত রূপটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে। নিচে এ খেলার ছড়ার উল্লেখ করা হলো।

যে হাতে চিমটি কাটে সে সহাস্যে জিজ্ঞেস করে-

কান্দা না খেলা?
তখন খেলোয়াড়টি উত্তর দেয়:
কান্দাও নয় খেলাও নয়!
আজার ছেড়ে দামড়া
ছ্যাড়াদিমোর চামড়া!

হাঁটি হাঁটি পা পা

শিশুরা সাধারণত সাত মাসের মধ্যে হামাগুড়ি দেয় ও নয় মাস বয়স থেকে হাঁটতে শিখে। অভিভাবকেরা শিশুর হাত ধরে ঘরের মেঝে অথবা প্রশস্ত আঙিনা দিয়ে হেঁটে নিয়ে বেড়ায় ও ছড়া আবৃত্তি করে।

ছেলেদের হাঁটা শেখানোর জন্য আওড়ানো হয়, এমন কয়েকটি ছড়া হচ্ছে–

(১)

আয় গ্যাদা আয়
আঁইটা উইটা আয়।
কাইয়ার ঠ্যাং বগের ঠ্যাং
ন্যাহরব্যাহরআঁ-ই-টা আয়।
আয় আয় কোলে
খাবি ঝালে ঝোলে।

(২)

সোনার বাবা আঁটে
তপন পিন্দা আঁটে।
মালকোঁচা দিয়া আঁটে গো
পালোয়ান আমার আঁটে।
আয় সোনার বাবা
পানি পুনি খাইবা।

(৩)

গ্যাদার নানা আইছে
কাচারি ঘরে বইছে।
গ্যাদা আমার আইটা যায়।
নানা আইনছে ঝুড়ি
গ্যাদায় করে দৈড়াদড়ি।

মেয়েদের হাঁটা শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় নিচের ছড়াগুলো–

সোনার মায়ে আঁটে
বিয়া দিমু ঘাটে।
যাইবা তুমি আঁইটা
হশুর তোমার কাইটা।

কখনো কখনো বোন-ভাইকে হাঁটতে শেখানোর সময় ছড়া বলে:

আমার ভাই হাঁটে রে সোনার নুনূর পায়।
হাঁটতে হাঁটতে ভাইটি আমার রাজ্যের দূর যায়।।

টোপাভাতি খেলা

ভাই আইব দৌড়াইয়া, ভাত দিয়াম বড়ইয়া
দুধ ভাত খাইশা ধুম, আচ্ছা কইরাম দিবো ঘুম।

ধাঁধার খেলা

ধাঁধার খেলায় সাধারণত দশ থেকে বিশজন পর্যন্ত খেলোয়াড় থাকে। এরা কোনো ছায়াঘেরা স্থানে সমান সংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বসে। তারপর একজন প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হয়ে উভয় দলের মাঝখানে বসে ধাঁধা আবৃত্তি করে এবং সমবেত খেলোয়াড়দের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করে। এইভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তর দেওয়ার ভেতর দিয়ে

খেলা চলতে থাকে। যে দল ধাঁধার উত্তর দিতে পারে, সেই দল ধাঁধার খেলায় জয়লাভ করে।

নিচে দু-চারটি ধাঁধার নমুনা দেওয়া হলো–

অগাঠুটি বগাঠুটি/উপর দ্যা উইড়্যা যায়
কুমকুম সুরে বাঁশি বাজায়/বাঁশিও তো না
উইড়্যা যাইতে ফ্যাকাম ধরে/ময়ূরও তো না
মানুষ খায় গরু খায়/বাঘও তো না। (ঢাকা)
উত্তর: মশা।
পাখি নয় গাছে রয়/অঙ্গ তার চারু
গায়ে কাঁটা আগাগোড়া/নয় সে সজারু
বাদুক নহেক তারা/ফুলে ফুলে ঝুলে
সৌরব গৌরব ফলে/নাহি কিছু ফুলে। (খুলনা)
উত্তর: কাঁঠাল।

কথায় হার-জিৎ

দু'জনের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়া কাটা চলে। ছড়ার শেষ শব্দটি দিয়ে একে অপরকে জব্দ করে।

এক কথা।
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ?
ছাও ব্যাঙ।
কি ছাও?
ব্যাঙ খাও।

ছড়াটি ভিন্নরূপেও বলা হয়,

এক কথা।
কি কথা?
ব্যাঙের মাথা।
কি ব্যাঙ?
তরু ব্যাঙ।
কি তরু?
নীল তরু।
কি নীল?
ঘু গিল।

ঘুঘুসি

রাতে কোনো শিশু ঘুমোতে দেরি করলে বয়স্ক কেউ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে তাকে দুই হাঁটুর ওপর নিয়ে দোল দিতে থাকে এবং নিজে নিজেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছড়া কেটে শিশুকে কল্পলোকে নিয়ে যায়। এ রকম একটি ছড়া হচ্ছে–

'ঘুঘুসি বুড়ি
গাঙের ঘাটে যাবি
ও বুড়ি তোর হাঁড়িকুড়ি সরাও
ছোটো তালগাছটা নড়েচড়ে
বড়ো তালগাছটা নড়েচড়ে।'

এরপর শিশুর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সোনার খাটে না রুপার খাটে পড়বে। তখন শিশু যে খাটে পড়তে চায় 'ঢিপ্পুস' বলে সেই খাটে ফেলা হয়। আসলে ডান বা বামদিকে শিশুকে কাত করে ফেলা হয়। অঞ্চলভেদে এই ছড়ার ভিন্নরূপ রয়েছে।

আগডুম বাগডুম

'আগডুম' মানে অগ্রবর্তী সৈন্য দল, 'বাগডুম' অর্থ পার্শ্ববর্তী ডোম সৈন্য দল। 'ঘোড়াডুম' অর্থ হচ্ছে অশ্বারোহী ডোম সৈন্য দল। আগডুম বাগডুম নামে একটি ছড়া শিশুদের জন্য সুখপাঠ্য। বই পড়তে শেখার পর সুর করে ছন্দে ছন্দে এই ছড়াটি পাঠ করে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করে। এই ছড়াকে কেন্দ্র করে বিশেষ এক ধরনের খেলা খেলে ছেলে-মেয়েরা।

ছোটো ছেলে-মেয়েরা গোল হয়ে বসে যায় মাটিতে। আসন পিঁড়ি করে বসতে হয় প্রত্যেককে। দলপতি থাকে একজন। সে ছড়ার একেকটি শব্দ উচ্চারণ করে এবং একেকজনের হাঁটু স্পর্শ করে। ছড়াটি হচ্ছে–

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাকঢোল ঝাঁঝর বাজে।।
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি
ঢুলি গেল কমলা ফুলি।।
কমলা ফুলির টিয়েটা
সূর্যি মামার বিয়েটা।।

আয় রঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।।
একটা পান ফোপড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।।

কচি কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে খুকু গা তোল।।
হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারার নামে টগর ফুল।।

ছড়াটি একেক অঞ্চলে একেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আওড়ানো হয়। ছড়ার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের পর

দড়িলাফ খেলা

একাধিক মাটির চারা। এগুলো চারকোনা আকৃতির। চারাটি পানির ওপরে এমনভাবে ছুড়তে হয় যাতে তা ব্যাঙের মতো লাফাতে থাকে। পানির ওপর দিয়ে চারাটি ছুটে যাওয়ার সময় কত বার লাফ দিল এবং কত দূরে গেল তার ওপরই নির্ধারণ করা হয় হারজিতের ব্যাপারটা।

চারাটি যখন ব্যাঙের মতো লাফিয়ে পানির ওপর দিয়ে যায় তখন একেক অঞ্চলে একেক

প্রত্যেকের হাঁটু স্পর্শ করার সময় খেলোয়াড়দের থাকে সতর্ক দৃষ্টি। যাতে কারো হাঁটু গণনা বাদ না যায়, অথবা কেউ কোনো ছলচাতুরীর আশ্রয় না নেয় দলপতি সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। ছড়ার শেষ শব্দটি যার হাঁটুতে এসে শেষ হয় সে হাঁটু গুটিয়ে রাখে। এভাবে গণনা করতে করতে যার দুই হাঁটু আগে ভাঁজ হয় সে প্রথম, এরপর দ্বিতীয় বা তৃতীয়।

পানি ঝুপ্পা

গ্রামবাংলায় ব্যাঙ লাফানো খেলা দু'রকম। পানি ঝুপ্পা খেলা খেলতে হয় পানিতে। তবে পানিতে হলেও খেলোয়াড়কে কিন্তু ভিজতে হয় না। ডাঙায় দাঁড়িয়েই খেলা যায়। এর আরেক নাম ব্যাঙ লাফানো। এই খেলায় ব্যবহার করা ছড়াগুলো এক সময় থাকত ছোটোদের মুখে মুখে।

খেলার জন্য প্রয়োজন হয় একটি পুকুর বা জলাশয়। খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের হাতে থাকে

লাফ খেলা

লাটিম খেলা

ধরনের ছড়া কাটা হয়। ফরিদপুর অঞ্চলের একটি ছড়া হচ্ছে–

ইমার ভাংলো ডিমা
জুহার ভাংলো ঠ্যাং
বাছেরের চাপ দাড়িতি
নাচে বাউয়া ব্যাঙ।
আরেকটি ছড়া হচ্ছে-
ব্যাঙ মারবি যে
ব্যাঙের ভাগীর সে
সাত পাল্লোকাপুড় দিয়ে মাটি দিবি সে।

ব্যাঙরে ব্যাঙ
এত লাফাস ক্যান?
মইরা গেলে পইড়া থাকবে
লম্বা দুইহান ঠ্যাং।

চিল ও হাঁসহাঁস

গ্রামবাংলায় পানির একটি খেলার নাম চিল ও হাঁসহাঁস খেলা। ঢাকা জেলায় এই খেলাটির প্রচলন বেশি। পাবনা অঞ্চলে এই খেলার নাম 'টগে'। হাঁস মুখে টক টক শব্দ করে বলে এমন নাম হয়েছে ধারণা করা হয়।

এই খেলায় পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করতে হয়। খেলার শুরুতে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়। একদল চিল এবং আরেক দল হাঁস। চিলের দলে থাকে একজন এবং বাকি সবাই হাঁসের দল। শুরুতেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কাটা হয় ছড়া।

হাঁসের দল: চিল রে চিল, তোর পায়ের তলে কী?
চিল: আন্ডা ফুটাইছি।
হাঁসের দল: আন্ডা করলি কী?
চিল: বেইচ্যা ফেলাইছি।
হাঁসের দল: পয়সা করলি কী?
চিল: পান কিন্যাছি। (লোক সাহিত্য: ঢাকা)

এভাবে ছড়া বলতে বলতে হাঁসের দল দেয় ডুব। এক ডুবে তারা চলে যায় বহুদূর। গভীর পানির তলা থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে। তখন চিল হাসের উদ্দেশ্যে ছড়া আবৃত্তি করে এবং চো-চি বলে ডাক দেয়।

ছড়াটি হচ্ছে:

হাঁসের গলায় পুঁতির হার
হাঁস গেল দক্ষিণ পার।
হাঁসের গলায় পুঁতির ছড়া
হাঁস গেল দক্ষিণ পাড়া।

চিলের এই ছড়া শুনে হাঁসের দল কিন্তু কোনো সাড়া দেয় না। তখন চিল রেগে যায়। ওদের ধরার চেষ্টা করে। দেয় ডুব বা সাঁতার। এভাবে ডুব ও সাঁতার দিয়ে একে একে ধরতে হবে সব খেলোয়াড়কে। যে হাঁস সবার শেষে ধরা পড়ে তাকে সাজতে হয় চিল।

ছড়ার খেলাগুলো মুখে মুখে প্রচলিত। বংশপরম্পরায় শুনে শুনে এগুলো টিকে আছে। একেক এলাকায় শব্দের উচ্চারণ আবার একেক রকম, যুগ যুগ ধরে এগুলো নানাভাবে পরিবর্তন হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সামীয়ূল ইসলামের লেখা 'বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলা'
২. লেখক রশীদ হায়দারের লেখা 'বাংলাদেশের খেলাধুলা'
৩. শংকর রায়ের লেখা 'বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি'
৪. শংকর সেনগুপ্তের লেখা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'
৫. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আরো কিছু বইপত্র থেকে। ■

ছন্দের খেলা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বৌচি খেলা

গ্রামবাংলায় এমন কিছু খেলা রয়েছে যেগুলো ছন্দ ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। ছন্দের ব্যবহার রয়েছে এমন দুটি খেলা নিয়ে তোমাদের বলছি-

বৌচি: এ খেলায় প্রথমত দুটি দল থাকে। প্রত্যেক দলে সাধারণত আট-দশজন করে খেলোয়ার থাকে। বাড়ির আঙিনায় অথবা খোলা মাঠে বৌচি খেলার আয়োজন করা হয়। খেলার শুরুতে ২৫/৩০ ফুট দূরে দূরে দুটি গোলাকার বৃত্ত মাটিতে আঁকা হয়। একটি বড়ো একটি ছোটো। দুই দলের মধ্যে দুজন দল নেতা থাকে। তাদের মধ্যে টসে যে জিতে তার দল প্রথমে খেলার সুযোগ পায়। এই দলের মধ্যে একজনকে বউ বানানো হয়। প্রথমে মাটিতে দাগ কেটে দুটি ঘর বানানো হয়, তার মধ্যে ছোটো ঘরটিতে বউ এবং অন্য বড়ো ঘরটিতে দলের অন্যরা সবাই থাকে। (এই খেলায় যেই দলের বউ খুব চালাকির সাথে খেলতে পারে সেই দলের জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকে)। বউ যে-কোনো সময় সুযোগ পেলেই চলে আসবে বড়ো ঘরে এই ভয়ে বিপক্ষ দলের সবাই সারাক্ষণ বউকে পাহারায় রাখে যাতে ঘর থেকে বউ বের হতে না পারে। আর ঘরের বাইরে আসলে কোনোভাবে যদি বিপক্ষ দলের কেউ বউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবেই সেই দলের খেলা শেষ। বিপক্ষ দলের খেলা শুরু। বড়ো ঘরটিতে থাকা খেলোয়াড়েরা এক এক করে দম নিয়ে

চু-চু চাচ্চারা কবুতরের বাচ্চারা,
বউছি খেলা কেমন খেলা
১০/১২টা মাইরা ফালা।

এ রকম ছন্দের তালে তালে ছড়া বলতে বলতে তাড়া করতে থাকে বউকে ঘিরে থাকা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের। তাড়া খেয়ে বিপক্ষ দলের সবাই এদিক -ওদিক ছুটে বেড়ায়। কারণ দম নেওয়া খেলোয়াড় যদি বিপক্ষের একজনকে ছুঁয়ে দেয় তবে ওই খেলার মধ্যে সে মরে যাবে। ওই দান চলা অবস্থায় আর সে খেলতে পারে না। এভাবে বউকে নিরাপদে ঘরে ফিরার সুযোগ তৈরি করে বউয়ের সঙ্গী খেলোয়াড়েরা। বিনা ছোঁয়ায় বউ বড়ো ঘরে চলে আসতে পারলে তারা ১ পয়েন্ট পায়। পুনরায় আবার নতুন করে খেলা শুরু করে। আর যদি বউকে বিপক্ষ দলের কেউ ছুঁয়ে দেয় তবে বিপক্ষ দল খেলার সুযোগ পায়। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

নুনতা বলো রে: এটি একটি গ্রামীণ খেলা। সাধারণত কিশোর বয়সি ছেলে-মেয়েরাই এই খেলাটি খেলে। নুনতা খেলায় যত বেশি জন অংশগ্রহণ করে তত বেশি মজা হয়। এই খেলায় একজনকে নুনতা নির্বাচন করা হয়। একটি গোলাকার দাগ কাটা ঘরে অন্যরা সবাই থাকে আর নুনতা ঘরের বাইরে। নুনতা ঘরের বাইরে থেকে বলে 'নুনতা বলো রে' অন্যরা সবাই বলতে থাকে 'একও হলোরে'। 'নুনতা বলো রে', 'দুইও হলো রে' এভাবে সাত পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর নুনতা আবার বলে- 'আমার ঘরে কে রে, আমি রে, কী খাস? লবণ খাই, লবণের দাম দিবি কবে? রাঙ্গা শুক্কুরবারে কয় ভাই কয় বোন, পাঁচ ভাই পাঁচ বোন, একটা বোন দিয়া যা ছুঁইতে পারলে নিয়া যা।' বলার সাথে সাথে নুনতা সবাইকে ধরার চেষ্টা করে। যাকে প্রথম ধরতে পারে সেও নুনতার সাথে অন্যদেরকে ধরতে যায়। এভাবে সবশেষে যাকে ধরতে পারে সে পরবর্তী দানের মালিক হয়। তবে নুনতা যদি দম নিয়ে দৌড়ানোর সময় দম ছেড়ে দেয় তবে তখন অন্যরা সবাই নুনতা ঘরে না পৌঁছানো পর্যন্ত পিঠে মারতে থাকে। ■

চাকার গাড়ি খেলা

আগেকার খেলাধুলা

সৈয়দ মাশহুদুল হক

আগের দিনে আমরা কত
খেলেছি মজার খেলা
সেসব খেলায় আজকে যেন
সকলের অবহেলা।

তোমরা খেলো ঘরে বসেই
কম্পিউটারে গেইম,
ভুলেই গেছ সেসব খেলা
জানো না তার নেইম।

এক্কাদোক্কা, ঘুড়ি উড়ানো
ওপেন টু বাইস্কোপ,
ছোটোবেলায় এসব খেলা
খেলেছি আমরা খুব।

ইচিং বিচিং, কড়ি খেলা,
ডাংগুলি, কানামাছি,
এখন এসব কেউ চেনে না
যায় না কাছাকাছি।

টোপাভাতি, কুতকুত আর
কাবাডি, ষোলোঘুঁটি,
লুকোচুরি, বৌচি খেলেই
হাসছি কুটিকুটি।

দাড়িয়াবান্ধা, হাডুডু আর
খেলে মোরগ লড়াই,
জেতার পরে বুক ফুলিয়ে
করছি কত বড়াই।

পানিঝুপ্পা, গোলাপ টগর,
রুমাল চুরি খেলে,
মা'র বকুনি খেয়েছি কত
সন্ধ্যায় ঘরে গেলে।

মার্বেল খেলা, ফুল টোকা
লাটিম, গোল্লাছুট,
খেলার জন্য পাড়ার মাঠে
হতাম একজোট।

মার্বেল খেলা

খেলা

মো. মুশফিকুল ইসলাম মিদুল

মনে পড়ে কিশোরবেলা
খেলেছি কত নানান খেলা,
ক্রিকেট ছিল শখের খেলা
খেলেছি বেলা-অবেলা।

একদিন বন্ধুরা সবাই মিলে
ক্রিকেট নিয়ে বাজি খেলে
বল ছুড়ে মেরেছি-
হাতে মেখে ধুলোবালি
বলের গতি দেখে
চারদিকে হাততালি।
পরের বলটিতে পেয়েছি ছক্কা
তারপরের বলটিতে একদম অক্কা।

আবার বল করি আশা রান আসবে
দর্শক চারদিকে খুশিতে হাসবে।
এভাবে খেলেছি পেয়েছি জয়
খেলাতে হার-জিৎ থাকবে নিশ্চয়।

৯ম শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

ছোট্টকালের খেলা

তৌসিফ আলম তুহিন

ছোট্টকালে খেলেছি মোরা
মজার সব খেলা
খেলতে খেলতে কেটে যেত
আনন্দে সারাবেলা।

কানামাছি, গোল্লাছুট
খেলতাম সকলে মিলে
ঘামে শরীর ভিজে গেলে
লাফিয়ে পড়তাম পাশের বিলে।

একাদশ শ্রেণি, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কুমিল্লা

জাতীয় খেলা হাডুডু

মেজবাউল হক

আমাদের দেশে হাডুডু একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় একে গ্রামবাংলার খেলাও বলা হয়। কোনো কোনো স্থানে আবার হাডুডুকে কাবাডি খেলাও বলা হয়। তবে এই খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও হাডুডু খেলার কোনো সঠিক নিয়মকানুন না থাকায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নিয়মে খেলা হতো। এ হাডুডু খেলাটি সাধারণত কিশোর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা খেলে থাকে। বর্ষা মৌসুমে স্কুল মাঠ, হাটবাজার বা উন্মুক্ত স্থানে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের দেওয়া হয় নানা রকম আকর্ষণীয় পুরস্কার। আনন্দ, হই হুল্লোড়ে জেগে উঠত বাংলার মাঠঘাট। বর্তমানে এ খেলাটি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাডুডু খেলাকে 'কাবাডি' নামকরণ করা হয় এবং এই খেলাকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এ্যামোচার কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশন কাবাডি খেলার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কাবাডি ফেডারেশন এই খেলার বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি করে। ১৯৭৪ সালে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম কাবাডি টেস্ট খেলে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটিই প্রথম ম্যাচ। ১৯৭৮ সালে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বার্মার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন' গঠিত হয়।

বাংলাদেশ কাবাডি দল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। জিতেছে স্বর্ণপদক পুরস্কারও। দক্ষিণ এশীয় গেমসে ১৯৮৫ সালে ২য় স্থান, ১৯৯৩ সালে ৩য় স্থান এবং ২০১০ সালে ৩য় স্থান অধিকার করে। ২০১০ সালে এশিয়ান গেমসে মেয়েদের কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়। এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের ছেলেদের অর্জন ৩টি রুপা ও ৩টি ব্রোঞ্জ। ২০১০ সালে 'সাফ' কাবাডিতে বাংলাদেশের ছেলে এবং মেয়ে দুই বিভাগই স্বর্ণ জেতে।

মো. তাসকিন আহমেদ হামিম, ২য় শ্রেণি, মোহাম্মদপুর আইডিয়াল একাডেমি, কুমিল্লা

হাডুডু খেলায় বালকদের মাঠ লম্বায় ১২.৫০ মিটার ও চওড়ায় ১০ মিটার। বালিকাদের কাবাডি খেলার মাঠ লম্বায় ১১ মিটার, চওড়ায় ৮ মিটার হয়। খেলার মাঠের ঠিক মাঝখানে একটি লাইন টানা থাকে; যাকে মধ্যরেখা বা চড়াই লাইন বলে। এই মধ্যরেখার দু-দিকে দু'অর্ধে দুটি লাইন টানা হয়, যাকে কোল লাইন বলে। মৃত বা আউট খেলোয়াড়দের জন্য মাঠের দুই পাশে ১ মিটার দূরে দুটি লাইন থাকে যাকে লবি বলা হয়।

প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। কিন্তু প্রতি দলের ৭ জন খেলোয়াড় একসাথে মাঠে নামে। বাকি ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকে। খেলা চলাকালীন সর্বাধিক তিনজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যায়। হাডুডু খেলা ৫ মিনিট বিরতিসহ দু'অর্ধে পুরুষদের ২৫ মিনিট করে এবং মেয়েদের ২০ মিনিট করে অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে সে দলই জয়ী হবে। দু-দলের পয়েন্ট সমান হলে দু'অর্ধে আরো ৫ মিনিট করে খেলা হবে। এরপরেও যদি পয়েন্ট সমান থাকে তবে যে দল প্রথম পয়েন্ট অর্জন করেছিল সে দলই জয়ী হবে। যদি কোনো খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে যায়, তাহলে সে আউট হয়। এভাবে একটি দলের সবাই আউট হলে বিপক্ষ দল অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পায়। মধ্যরেখা থেকে দম নিয়ে বিপক্ষ দলের কোনো খেলোয়াড়কে (একাধিক হতে পারে) স্পর্শ করে এক নিশ্বাসে নিরাপদে নিজেদের কোর্টে ফিরে আসতে পারলে, যাদেরকে স্পর্শ করবে সে বা তারা আউট হয়। এভাবে যত জন আউট হবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক পয়েন্ট পাওয়া যায়।

এক নিশ্বাসে স্পষ্টভাবে বার বার হাডুডু বা কাবাডি বলে ডাক দেওয়াকে 'দম' বলে। এই দম মধ্যরেখা থেকে শুরু করতে হয়। বিপক্ষ কোর্টে একসাথে একাধিক আক্রমণকারী যেতে পারবে না। কোনো আক্রমণকারী বিপক্ষ দলের কোর্টে দম হারালে এবং বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তাকে স্পর্শ করতে পারলে সে আক্রমণকারী আউট বলে গণ্য হয়। ■

মাছি খেলছে কানামাছি

খায়রুল বাবুই

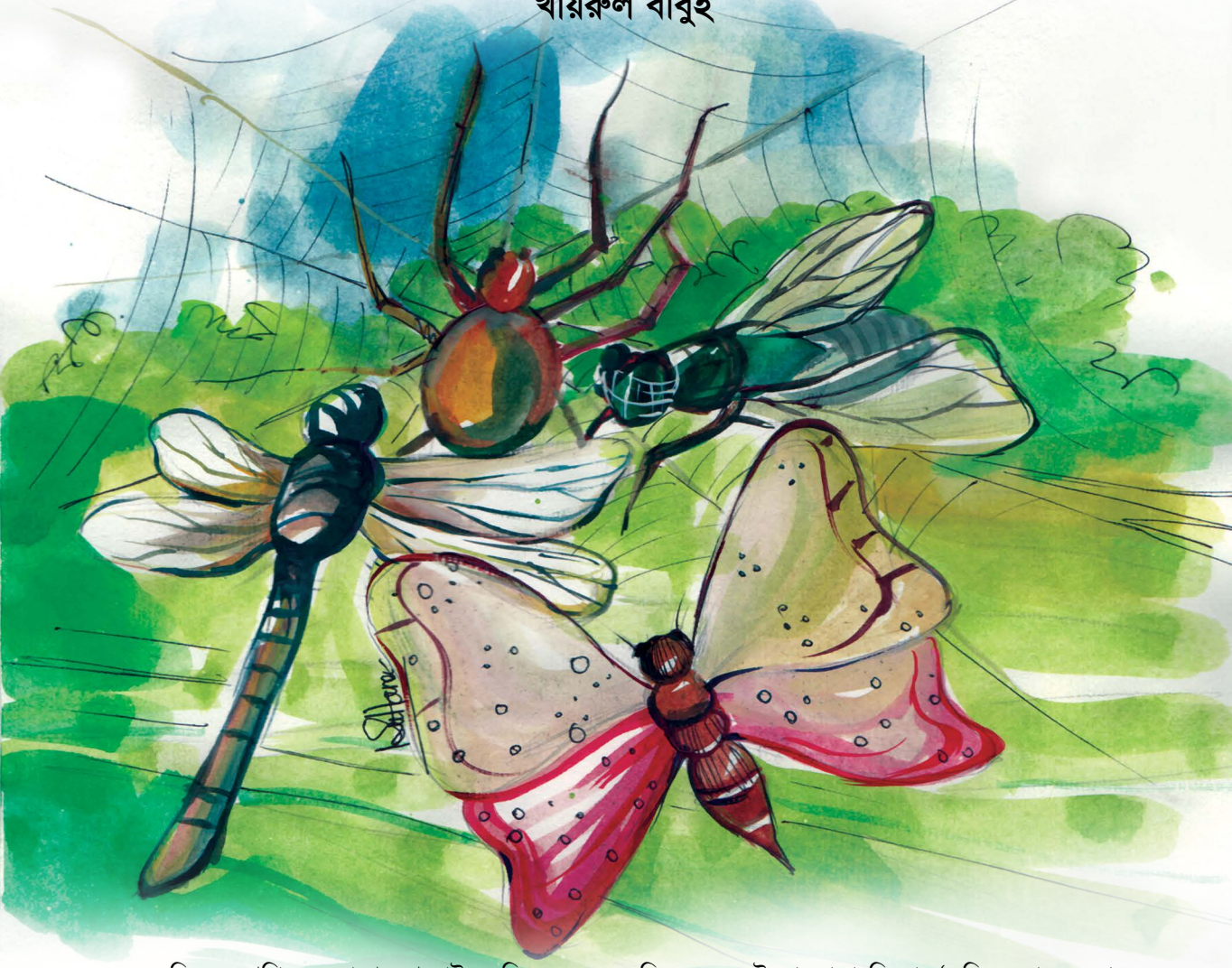

মুম্মি এত খুশি এর আগে কখনোই হয়নি। আজই প্রথম সে তার মায়ের সঙ্গে ঘুরতে বের হয়েছে।

ঠিক ঘুরতে না, উড়তে!

মুম্মি হলো একটা বাচ্চা মাছি। ওর বয়স মাত্র আড়াই দিন। দুপুরে মা বলেছিল, 'মুম্মি, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। বিকেলে তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব।'

ব্যাস, কীসের ঘুম! উত্তেজনায় মুম্মি তার পাঁচটা চোখের কোনোটাই বন্ধ করতে পারেনি।

বিকেল হতেই মা তাড়া দিলো, 'মুম্মি চলো। সন্ধ্যার আগে আবার বাড়ি ফিরতে হবে।'

মুম্মি বলল, 'হ্যাঁ মা, আমি রেডি।'

মা পাখা মেলল। মুম্মিও মায়ের পিছু পিছু উড়তে লাগল। ছোট্ট ছোট্ট পাখা মেলে।

উড়তে উড়তে তারা চলে এল একটা মাঠের পাশে। মা গিয়ে বসল একটা গাছের পাতার ওপর। পাশের পাতায় বসল মুম্মি। দেখল, মাঠে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দৌড়ঝাঁপ করছে।

'মা, ওরা কারা?' মুন্মি জানতে চায়।
'তুমি যেমন মাছির মেয়ে, ওরাও তেমন মানুষের ছেলে-মেয়ে।'
'ওরা কী করছে এখানে?'
'খেলাধুলা করছে।'
'খেলাধুলা করছে কেন?'
মুন্মির বোকা বোকা প্রশ্ন শুনে মা হাসে, 'খেলাধুলা করলে শরীর-মন দুটোই ভালো থাকে।'
'আচ্ছা।' মুন্মি গম্ভীর হয়ে বোঝার চেষ্টা করে। আর মনোযোগ দিয়ে মাঠের চারপাশে তাকায়। ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছোটো দল বেধে নানারকম খেলায় ব্যস্ত।
'মা, ওরা ওই গোল জিনিসটার পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে কেন?'
'ওটার নাম ফুটবল। পা দিয়ে খেলতে হয়, তাই ওটাকে বলে ফুটবল খেলা।'
'বাহ! কী মজা!' মুন্মির চোখে-মুখে আনন্দ। এবার অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা মা, দেখো, ওখানে কয়েকটা ছেলে দড়ি নিয়ে লাফালাফি করছে।'
'এই খেলাকে বলে দড়িলাফ,' মা বুঝিয়ে বলল– 'যে একটানা যত বেশি লাফ দিতে পারবে– সে-ই জিতবে।'
হঠাৎ মুন্মির চোখ পড়ল অন্য একটা জটলার দিকে। দু'জন ছেলে পাশাপাশি বসে উচ্চতা বানাচ্ছে। অন্যেরা লাফিয়ে লাফিয়ে সেই উচ্চতা পার হচ্ছে।
'ওখানে ওরা কী করছে মা?'
মা বলল, 'এটাও এক ধরনের খেলা। ইচিং বিচিং। এই খেলাটার সময় ছড়া কাটতে হয়–

ইচিং বিচিং চিচিং ছা
প্রজাপতি উড়ে যা...।

এরকম অদ্ভুত নামের সব খেলা দেখে মুন্মির খুশি যেন আর ধরে না। হঠাৎ তার চোখ যায় একটু দূরে, মাঠের আরেক কোণে। একটি ছোটো ছেলে অন্ধের মতো দুই হাত বাড়িয়ে অন্যদের খুঁজছে। তার চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা।
মুন্মি দেখেই আঁতকে উঠল। মাকে বলল, 'মা মা, দেখো একটা অন্ধ ছেলে।'
মা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'ও অন্ধ না মুন্মি।'
'তাহলে ওর চোখ বাঁধা কেন মা?'
'ওরা খেলছে।'
'ওরা কি আমাদের মতো উড়তে পারে?'
'না।'
মুন্মি খুব অবাক হয়, 'তাহলে চোখ বাঁধা থাকলে পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে তো।'
'এই খেলার নাম কানামাছি।'
'কানামাছি? আমাদের নামে? এ কেমন খেলা?'
মা বলল, 'তাহলে শোনো...।'
মুন্মি খেলা দেখা বাদ দিয়ে মায়ের কথায় মনোযোগ দেয়। মা বলতে থাকে, 'কানামাছি খেলা খুবই মজার। প্রথমে কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। যার চোখ বাঁধা হয়, সে হয় 'কানা'। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই সে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে।'
'কেন ধরার চেষ্টা করে মা?'
'আরে, এটাই তো খেলার মজা।'
'আচ্ছা। তারপর কী হয়?'
'তারপর, অন্যরা 'কানা' বন্ধুর চারদিকে ঘুরে ঘুরে 'কানামাছি ছড়া' বলে। বলতে বলতে তার গায়ে টোকা দেয়। সে যদি কাউকে ধরতে পারে এবং বলতে পারে তার নাম, তাহলে যে ধরা পড়বে তাকেই 'কানা' সাজতে হয়।'
'আচ্ছা মা, কানামাছি ছড়াটা আবার কী?'
'যে ছড়াটা পড়তে পড়তে সবাই কানাকে টোকা দেয়, সেটাই কানামাছি ছড়া। খুব মজার–

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যারে পাবি তারে ছোঁ...।

মুন্মি বিস্ময় নিয়ে বলে, 'মা, আমরা ওড়ার সময় ভোঁ-ভোঁ করে আওয়াজ হয়, তাই?'
মা হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে।'
একটু চুপ থেকে কী যেন ভাবে মুন্মি। তারপর বেশ আহ্লাদের সঙ্গে বলে, 'মা মা, আমিও কানামাছি খেলব।'
মা অবাক হয় মুন্মির আবদার শুনে, 'কীভাবে? কানামাছি তো দল বেধে খেলতে হয়।'
'আমি ওদের সঙ্গে খেলব।'
'বলে কি! ওরা ছোটো হলেও তো আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো। তুমি কীভাবে ওদের সঙ্গে খেলবে?'
মায়ের কথা শুনে মুন্মির মন খারাপ হয়, 'তাহলে উপায় কী? আমার কি কানামাছি খেলা হবে না?'
মা চিন্তায় পড়ে যায়। মুন্মির মন খারাপ হবে– এটা কিছুতেই মানা যায় না। একটু ভেবে বলে, 'আচ্ছা। আগামীকাল বিকেলে তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে

কানামাছি খেলতে এসো। এখন বাড়ি চলো। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।'

মুন্মিরা থাকে একটা মাছের আড়তে। যদিও মাছের চাইতে ফলের আড়তে থাকতেই মুন্মির ভালো লাগে। কারণ ওখানকার পরিবেশটা সুন্দর। নানারকম সুবাস পাওয়া যায়। যাহোক, আগামীকাল কানামাছি খেলা হবে– এই অপেক্ষা আর উত্তেজনা নিয়ে মুন্মি মায়ের সঙ্গে উড়ে চলে তাদের বাড়ি, মানে মাছের আড়তের দিকে।

দুই

পরদিন বিকেল।

মাছের আড়তের পিছনে একটা পুকুর। তার পাশেই একটা বড়ো খালি জমি। মাঠের মতোই।

সবাই হাজির সেখানে। কানামাছি খেলবে।

মুন্মি অনেক বলে-কয়ে বন্ধুদের রাজি করিয়েছে। ওদের মধ্যে আছে ফড়িং, ঘাসফড়িং আর প্রজাপতি। প্রজাপতি তো আসতেই চাইছিল না। এসব খেলাধুলা নাকি ওর ভালো লাগে না। ওর শুধু বাগানে উড়ে বেড়ানোই শখ। তবুও ফড়িং আর ঘাসফড়িং বলাতে রাজি হয়েছে।

প্রজাপতি বলল, 'কানামাছি কীভাবে খেলতে হয়?'

মুন্মি সবাইকে কানামাছি খেলার নিয়ম বলে দিলো। কিন্তু কানা কে হবে– এই নিয়ে বাঁধল বিপত্তি। কেউ কানা সাজতে রাজি নয়।

অবশেষে মুন্মি বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আমিই কানা হবো।'

কিন্তু তাতেও সমস্যা। চোখ বাধবে কী দিয়ে? কাপড় পাবে কই?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল সবাই। একটু পর লাফিয়ে উঠল ঘাসফড়িং, 'মাকড়সার সাহায্য নিতে পারি আমরা।'

'কীভাবে?' প্রজাপতি অবাক।

'আরে, মাকড়সার কাছ থেকে ওর বোনা একটু জাল নিয়ে এলেই তো হবে। চোখ বাঁধা যাবে।'

'বুদ্ধিটা তো মন্দ না।' মুন্মি বলল।

'কিন্তু মাকড়সার জাল কোথায় পাব?' প্রজাপতি বেশ চিন্তায় পড়ে গেল।

'চলো, আশেপাশে সবাই খুঁজে দেখি।' ফড়িং বলল।

'হ্যাঁ চলো।' মুন্মি সায় দিলো।

জমিটার পাশেই ছিল একটা ঝোপ। সেখানেই দেখা মিলল মাকড়সার। পাওয়া গেল জালও। কিন্তু সব শোনার পর বেঁকে বসল মাকড়সা, 'আমাকেও খেলায় নিতে হবে।'

কী আর করা! উপায় নেই। তাই সবাই রাজি হলো।

'কিন্তু আবারও তো সমস্যা।' ঘাসফড়িং বলল।

'আবার কী সমস্যা?' প্রজাপতি একটু বিরক্ত হয়।

'আমরা তো উড়ে উড়ে কানামাছি খেলব। মাকড়সা কীভাবে খেলবে? ও তো আমাদের মতো উড়তে পারবে না।'

আরে, তাই তো। ঘাসফড়িংয়ের কথা শুনে সবাই আরেক দফা চিন্তায় ডুবে গেল।

অবশেষে সমাধান দিলো মাকড়সা নিজেই, 'আচ্ছা, তোমরা উড়ে উড়ে জায়গা বদল করো। আমি এই ঝোপের ওপরই এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলব।'

'ঠিক আছে।' সবাই সায় দিলো মাকড়সার কথায়।

অতঃপর মাকড়সার জাল দিয়ে বাঁধা হলো মুন্মির চোখ। প্রজাপতি, ফড়িং, ঘাসফড়িং আর মাকড়সা মুন্মির চারদিক ঘিরে উড়তে-লাফাতে শুরু করল। একই সঙ্গে 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যারে পাবি তারে ছোঁ...' বলতে বলতে সবাই মুন্মিকে টোকা দিতে লাগল।

প্রথম টোকাটা খেয়ে মুন্মি বুঝল– এটা ঘাসফড়িং দিয়েছে। সে ওদিকে উড়তে গিয়েই ধাক্কা খেল একটা লম্বা ঘাসের ডগার সঙ্গে। তাই দেখে হি হি করে হেসে উঠল সবাই।

এরপর প্রজাপতি তার পাখনা দিয়ে টোকা দিলো মুন্মিকে। মুন্মি প্রজাপতিটাকে ধরার চেষ্টা করল। পারল না। বরং উড়ে গিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে বসে থাকা মাকড়সার গায়ের ওপর।

'ধরেছি, ধরেছি...' বলে চিৎকার করতে করতে চোখ থেকে বাঁধন খুলে ফেলল মুন্মি।

এবার মাকড়সার 'কানা' হওয়ার পালা। নিজের বোনা জাল দিয়েই বাঁধা হলো মাকড়সার চোখ। এরপর 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ...' ছড়া কাটতে কাটতে তার চারপাশে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল মাছি, প্রজাপতি, ফড়িং আর ঘাসফড়িং।

বন্ধুদের সঙ্গে দল বেধে কানামাছি খেলছে আদরের মেয়ে মাছিটা– দূর থেকে এই দৃশ্য দেখল মুন্মির মা। হাসি ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। ■

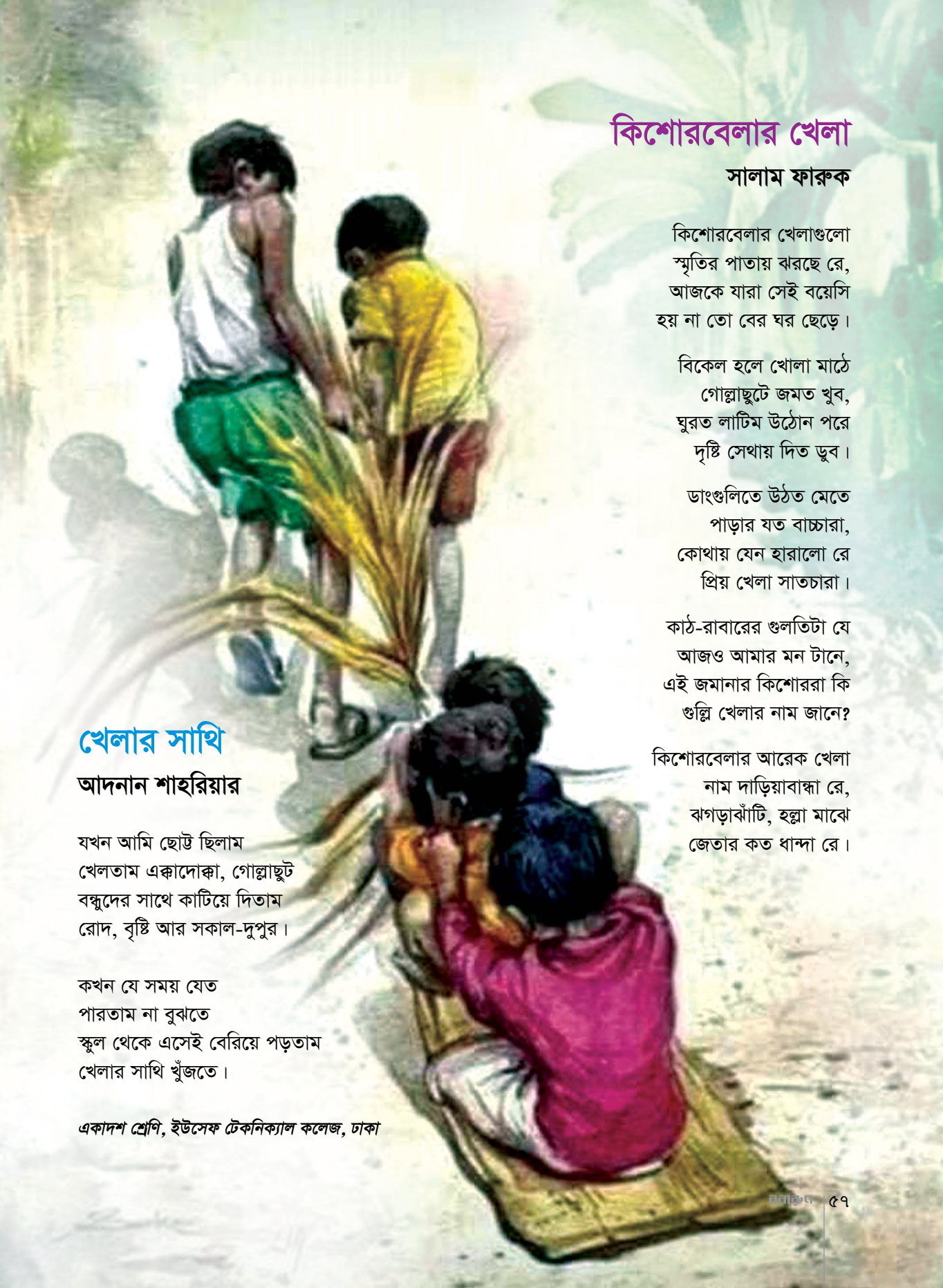

কিশোরবেলার খেলা

সালাম ফারুক

কিশোরবেলার খেলাগুলো
স্মৃতির পাতায় ঝরছে রে,
আজকে যারা সেই বয়েসি
হয় না তো বের ঘর ছেড়ে।

বিকেল হলে খোলা মাঠে
গোল্লাছুটে জমত খুব,
ঘুরত লাটিম উঠোন পরে
দৃষ্টি সেথায় দিত ডুব।

ডাংগুলিতে উঠত মেতে
পাড়ার যত বাচ্চারা,
কোথায় যেন হারালো রে
প্রিয় খেলা সাতচারা।

কাঠ-রাবারের গুলতিটা যে
আজও আমার মন টানে,
এই জমানার কিশোররা কি
গুল্লি খেলার নাম জানে?

কিশোরবেলার আরেক খেলা
নাম দাড়িয়াবান্ধা রে,
ঝগড়াঝাঁটি, হল্লা মাঝে
জেতার কত ধান্দা রে।

খেলার সাথি

আদনান শাহরিয়ার

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম
খেলতাম এক্কাদোক্কা, গোল্লাছুট
বন্ধুদের সাথে কাটিয়ে দিতাম
রোদ, বৃষ্টি আর সকাল-দুপুর।

কখন যে সময় যেত
পারতাম না বুঝতে
স্কুল থেকে এসেই বেরিয়ে পড়তাম
খেলার সাথি খুঁজতে।

একাদশ শ্রেণি, ইউসেফ টেকনিক্যাল কলেজ, ঢাকা

বলী খেলা

উৎসবের খেলা

মো. জামাল উদ্দিন

শরীর ও মনের সুস্থতার উপরই নির্ভর করে তার অনাগত দিনের সুখ-সমৃদ্ধি। খেলাধুলা তাই শরীর ও মন গঠনের এক অন্যতম উৎস। দেশে দেশে যুগে যুগে খেলাধুলারও হয়েছে নানা রূপান্তর। নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম বিভিন্ন উৎসবে যেসব খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জব্বারের বলী খেলা : ঐতিহ্যবাহী এ খেলাটি মোঘল আমল থেকে চলে আসছে। চট্টগ্রামের আব্দুল জব্বার সওদাগর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত যুব সমাজকে শারীরিকভাবে উপযুক্ত করার জন্য এই খেলার পুনরুজ্জীবন ঘটান ১৯০৯ সালে। চট্টগ্রামের নানান জায়গার – রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলার বলীরা অংশ নেয় এই খেলায়। বলী মানে শক্তিমান। শক্তি আর কসরতের খেলা এটি। বলীরা একজন আরেকজনকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা চালায় নানান কৌশলে। কায়দা-কসরতে যে বলী চৌকস বেশি আর প্রতিদ্বন্দ্বীর পিঠকে ছোঁয়াতে পারেন মাটিতে বিজয়ের স্বীকৃতি তারই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে জুনিয়র ও সিনিয়র দুই ক্যাটাগরিতে। শিরোপা জিতলে নগদ সম্মাননা, ক্রেস্ট আর গোল্ড মেডেল তো মিলেই স্বীকৃতি পায় আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের গল্পে। একাধিক রাউন্ডে টিকে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা বলী-ই ঘোষিত হয় চ্যাম্পিয়ন। ঐতিহ্যের নগরী চট্টগ্রামে জব্বারের শতাব্দী প্রাচীন এই বলী খেলা যেমন উত্তেজনার তেমনি আনন্দদায়ক।

ঘোড়া দৌড়: ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী খেলা। ঘোড়ার পিঠে একজন সওয়ার থাকে। সে ঘোড়াকে চালনা করে।

যার ঘোড়া আগে যায় সে হয় বিজয়ী। এখনো কোনো কোনো এলাকার সাধারণ মানুষ এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

ষাঁড়ের লড়াই : অতীতে বাংলাদেশে ষাঁড়ের লড়াই একটি প্রসিদ্ধ খেলারূপে প্রচলন ছিল। লড়াই করার জন্য ষাঁড় বা গরু আলাদাভাবে লালন পালন করা হতো। শুকনো মৌসুমে গ্রামের বাজারে ঢোল পিটিয়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখার আমন্ত্রণ জানানো হতো। মাঠে ষাঁড়ের মালিকরা তাদের ষাঁড়গুলোকে বিভিন্ন রঙিন কাপড়, ঘুঙুর দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসতেন। দুদিকে দুজন রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসে দুপক্ষের ষাঁড়কে ছেড়ে দিয়ে সবাই মিলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ও বিভিন্ন তালে তালে গান করত। এভাবে উপস্থিত সকল ষাঁড়ের মধ্যে যে ষাঁড়টি প্রথম স্থান পেত তাকে পুরস্কার দেয়া হতো। বর্তমানে এই শৌখিন প্রথা বিলুপ্তির পথে।

লাঠি খেলা : পরাক্রম ও সাহস প্রদর্শনের জন্য লাঠি খেলা। এই খেলার জন্য ব্যবহৃত লাঠি সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা এবং তৈলাক্ত হয়। নানা কৌশলের সঙ্গে প্রত্যেক খেলোয়াড় তাদের নিজ নিজ লাঠি দিয়ে রণকৌশল প্রদর্শন করে। লাঠিখেলার আসরে লাঠির পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল, ঝুমঝুমি, কাড়া এসব ব্যবহার করা হয়।

গরুরগাড়ি দৌড় : গরুর গাড়ি হলো দুই চাকাবিশিষ্ট গরু বা বলদে টানা একপ্রকার যান। এই যানে একটি মাত্র অক্ষের সাথে চাকা দুটি যুক্ত থাকে। সামনের দিকে একটি জোয়ালের সাথে দুটি গরু বা বলদ জুড়ে এই গাড়ি টানা হয়। শুকনো মৌসুমে আনন্দ আর উৎসবের অংশ হিসেবে গরুগাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা করা হয়। গাড়োয়ানের মুখে আর হাতে লাঠির শব্দে গরু জোরে দৌড়াতে থাকে। যে আগে মাঠের সীমানা শেষ করে সেই গরুর মালিক হয় বিজয়ী। মালা আর পুরস্কারের যোগ্য উত্তরাধিকার।

নৌকাবাইচ/ভেলাবাইচ: উৎসবের খেলা নৌকা বাইচ। এ খেলার মূল উপকরণ হলো নৌকা। এটি দেখতে সরু ও লম্বাটে। যাতে নদীর পানি সহজে কেটে দ্রুত চলতে পারে। নৌকাটিকে উজ্জ্বল রঙের কারুকাজ করে বিভিন্ন নকশা দিয়ে সাজানো হয়। সকলে একই রকমের পোশাক পরে। সবার মধ্যখানে থাকেন নৌকার নির্দেশক। প্রতিটি নৌকায় ৭, ২৫, ৫০ বা ১০০ জন মাঝি থাকতে পারে। অন্য সব নৌকাকে পেছনে ফেলে নিজেদের নৌকাকে সবার আগে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সবার মুখে থাকে সারি গান। হৈ, হৈয়া শব্দের তালে তালে এগিয়ে যায় নৌকা। কলা গাছ দিয়ে ভেলা তৈরি করে প্রতিযোগীতা করা হলো ভেলাবাইচ। নিয়ম নৌকাবাইচের মতো।

বালিশ লড়াই : এটি মজার একটি খেলা। ভাগ হয়ে সবাই খেলায় অংশ নেয়। একেক গ্রুপে ২ জন করে থাকে। নকআউট পদ্ধতিতে ফাইনাল নির্ধারণ করা

হয়। সবশেষে একজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। খেলা শুরুর আগে বাঁশ দিয়ে নদীতে পানির মধ্যে আড় তৈরি করা হয়। আড়ের দুই পাশে দুই জন বসে বালিশ হাতে নিয়ে লড়াই করতে থাকে। এই লড়াইয়ে যে আড় থেকে পড়ে যায় সে আউট হয়।

কলাগাছে উঠা : মাঠের শেষ প্রান্তে তেল মাখানো কলাগাছ মাটিতে পোঁতা থাকে। মাঠের অপর প্রান্তে থাকে প্রতিযোগী। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে যারা সবার আগে কলাগাছে উঠতে পারে, তারাই প্রথম এই খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এতে একটা নির্ধারিত সময় থাকে এই সময়ের মধ্যে কলাগাছে কেউ-ই উঠতে না পারলে পরবর্তী প্রতিযোগীদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়। কলাগাছ বেয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাছের মাথায় যে সবার আগে উঠতে পারে সেই বিজয়ী হয়।

কলাগাছে উঠা

তৈলাক্ত বাঁশে উঠা : কলা গাছে উঠা আর তৈলাক্ত বাঁশে উঠা একই নিয়মের খেলা। বিভিন্ন উৎসবে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেক সময় ফসল কাটার পর খোলা মাঠে আয়োজন করা হয়। ■

জনপ্রিয় খেলা

মো. ইকবাল হোসেন

খেলা আমাদের সবার কাছে সমান প্রিয়। সময় পেলেই খেলা নিয়ে সবাই মেতে উঠে। আবার এমন অনেক খেলা আছে যেগুলো দেশ কাল পাত্র ভেদে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যে খেলা বেশি হয়ে থাকে, দর্শকও প্রচুর হয় এবং অধিক আয় হয়- সেটাই জনপ্রিয় খেলা। তেমনি জনপ্রিয় কয়েকটি খেলা তোমাদের জন্য তুলে ধরা হলো–

ফুটবল : পৃথিবীতে ফুটবল খেলা হয় না এমন দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফুটবলের জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র ফুটবলের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফুটবলের জনপ্রিয়তা এতটাই যে, সাত মহাদেশ জুড়ে ৪০০ কোটি দর্শক ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে এ খেলাটি ছড়িয়ে আছে আনাচে-কানাচে।

ক্রিকেট : জনপ্রিয়তার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ক্রিকেট। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজসহ সারা পৃথিবী জুড়ে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি দর্শক রয়েছে ক্রিকেটের। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বেশ সুনামের সাথে এগিয়ে চলছে। অনেক বড়ো বড়ো দল এখন বাংলাদেশকে সমীহ করছে। ইতিমধ্যে এ দলটি অর্জন করছে আন্তর্জাতিক ট্রফিও।

বাস্কেটবল: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চায়না এবং ফিলিপাইনে জনপ্রিয় খেলা বাস্কেটবল। আমাদের দেশেও এ খেলাটির প্রসার ঘটছে।

হকি : খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ শতাব্দীতে গ্রিসে হকি খেলা শুরু হয়। বাংলাদেশে এ খেলাটি আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আছে হকির জাতীয় দলও। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হকি দল এখন অংশ নিচ্ছে।

টেনিস : প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম টেনিস খেলা শুরু হয় ১৮৫৯ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। বিদেশের এ

খেলাটি এখন বাংলাদেশেও খেলা হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের এ খেলাটি নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই।

ভলিবল : এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভলিবল খুবই জনপ্রিয় খেলা। সারা পৃথিবীতে ভলিবলের সমর্থক ৯০ কোটির মতো। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলেও এ খেলাটি অনেক প্রিয় খেলা।

টেবিল টেনিস : এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় টেবিল টেনিস খুবই জনপ্রিয় খেলা। টেবিল টেনিসের অপর নাম পিং পং বল গেম। পিং পং বল দিয়ে খেলা হয় বলেই এ নামকরণ হয়েছে। বাংলাদেশেও অনেক আগে থেকেই এ খেলাটি চালু রয়েছে। আমাদের রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় জোবেদা রহমান লিনু। যিনি টেবিল টেনিসে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। এ খেলাটির সঙ্গে এ দেশের মানুষ এখন বেশ পরিচিত।

গল্‌ফ : এ খেলাটি বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ ভালো ভাবে পরিচিত। আমাদের কয়েকজন গল্‌ফার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সফল ভাবে অংশ নিচ্ছে। এ দেশেও হচ্ছে গল্‌ফ এর বিভিন্ন টুর্নামেন্ট। ■

রুমাল গেল কই?

আহমেদ রিয়াজ

বাড়ির সামনে ছোট্ট এক চিলতে উঠান। উঠানটায় ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। সবুজ গালিচার উপর গোল হয়ে বসে আছে ওরা। পায়েল, মেঘলা, নিপু ও রিতু। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তিলকা। তিলকার হাতে একটা লাল রুমাল। সবার চারপাশে ঘুরছে তিলকা। ঘুরছে আর জোরে জোরে বলছে,

'রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।
রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।'
রুমাল চুরি খেলছে ওরা।

হঠাৎ ওখানে এল আয়েশা। খেলা বন্ধ করে সবাই আয়েশার দিকে তাকিয়ে রইল। সঙ্গে কে ও? কী মিষ্টি মেয়েটা!
আয়েশা পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এই হলো রিমি। আমার মামাত বোন।'
রিমির দিকে তাকাল তিলকা। মিষ্টি হেসে বলল, 'কেমন আছ রিমি?'
রিমি কিন্তু কিছু বলল না। খুব লজ্জা পেয়েছে ও। লাজুক চোখে তাকিয়ে আছে সবার দিকে।
পায়েল বলল, 'তোমাকে স্বাগত রিমি।'
তবু রিমি কিছু বলল না।
নিপু বলল, 'আমরা রুমাল চুরি খেলছি। আমাদের সঙ্গে খেলবে রিমি?'
রিতু বলল, 'চল সবাই মিলে খেলি।'
এবারও রিমি কিছু বলল না। শুধু সবার দিকে তাকাল।
এবার আয়েশা বলল, 'রিমি, এরা সবাই আমার বন্ধু। আমি ওদের সঙ্গে খেলব। তুমি খেলবে?'
আয়েশার কথারও জবাব দিলো না রিমি। বরং আরো আটসাঁট হয়ে গেল। কাছেও এল না। সবার থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রইল।
সবাইকে তাড়া দিলো তিলকা, 'সরো সরো, আয়েশা আর রিমিকে বসার জন্য জায়গা করে দাও।'
সবাই একটু সরে সরে বসল। জায়গা ফাঁকা হলো। একটা ফাঁকা জায়গায় আয়েশা বসল। আয়েশ করে বসে আয়েশা বলল, 'চলে এসো রিমি। আমরাও রুমাল চুরি খেলব।'
তারপর একটা খালি জায়গা দেখিয়ে বলল, 'ওখানে বসে যাও।' তবু রিমি কিছু বলল না। বসা তো দূরের

কথা, কাছেও এল না। দূরেই দাঁড়িয়ে রইল।
নিপু বলল, 'উফ, খেলা শুরু হতে আর কত দেরি? আমার তর সইছে না।'
আয়েশা বলল, 'শুরু করো খেলা।'
আবারও রিমির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলো তিলকা। জানতে চাইল, 'রিমি খেলবে না?'
তবু রিমি কিছু বলল না।
কী আর করা! খেলা শুরু করে দিলো তিলকা। রুমাল নিয়ে ঘুরতে লাগল সবার পিছনে। আর বলতে লাগল-

'রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।
রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।'

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হঠাৎ...
চুপিসারে নিপুর পিছনে রুমাল রাখল তিলকা। একটুও টের পেল না নিপু। ততক্ষণে সবার পিছনে আরো একবার ঘোরা শেষ করল তিলকা। আর ঘুরে এসে দেখল নিপু তখনও রুমাল নেয়নি। তার মানে পিছনে যে রুমাল আছে সেটা তখনও টের পায়নি নিপু। ব্যস! অমনি...
নিপুর পিঠে কিল মারতে লাগল তিলকা।
কিল খেয়েই নিপু বুঝল রুমালটা ওর পিছনে ছিল। লাফ দিয়ে উঠল নিপু। এখন নিপু হলো চোর।
রুমাল নিয়ে ঘুরতে শুরু করল নিপু। আর খেলার বোলটি বলতে লাগল।

হঠাৎ...
নিপু আয়েশার পিছনে এল। কিন্তু রুমাল যেই রাখতে যাবে, অমনি দেখল রুমাল ওর হাতে নেই।
নিপু বলল, 'রুমাল গেল কই?'
সবাই এবার সবার পিছনে তাকাল। নাহ। কারো পিছনে রুমাল নেই। নিপুর হাতেও নেই। তাহলে রুমাল গেল কই?
সবাই অবাক! সবাই চেঁচাতে লাগল, 'রুমাল গেল কই?

রুমাল গেল কই?
রুমাল গেল কই?'

ওদিকে ওদের কাণ্ড দেখছে আর হাসছে রিমি। ওর চোখে-মুখে কৌতূহল। সত্যিই তো! রুমাল গেল কই?
এবার একটু সামনে এল রিমি। ইতিউতি তাকিয়ে রুমাল খুঁজতে লাগল। কিন্তু রুমাল গেল কই?
এবার উঠে দাঁড়াল সবাই। রুমাল খুঁজতে শুরু করল। এদিক-ওদিক। এখানে সেখানে। তারপর রিমির চারপাশে। সবার মতো ছুটোছুটি করছে না রিমি। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার কাণ্ড দেখছে। আর হাসছে। খুব মজা পেয়েছে ও।
কিন্তু রুমাল গেল কই?
হঠাৎ...
রিমি দেখল সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। খুব অবাক হলো ও। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন?
সবাই ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠল, 'রুমাল গেল কই? রুমাল গেল কই?'
এবার রিমিও সবার সঙ্গে গলা মেলাল, 'রুমাল গেল কই?'
আর অমনি...
সবাই আবার একসাথে বলে উঠল, 'রুমাল গেল ওই।'
বলেই সবাই ছুটে এল রিমির কাছে।
আয়েশা বলল, 'রুমাল তোমার মাথার উপর রিমি।'
চট করে মাথায় হাত দিলো রিমি। আর অমনি রুমাল চলে এল ওর হাতে।
সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'রুমাল চোর! রুমাল চোর!'
বলেই রিমির চারদিকে ঘুরতে লাগল।
রুমালটা নিপুর দিকে বাড়িয়ে দিলো রিমি। নিপু বলল, 'হবে না। যে রুমাল পাবে সে-ই হবে চোর। এটাই রুমাল চুরি খেলার নিয়ম। এখন তুমি রুমাল চোর।'
তিলকা বলল, 'এবার তুমি সবার পিছনে ঘুরবে রিমি। আর তুমিই ঠিক করবে কে হবে রুমাল চোর।'
ততক্ষণে বেশ সহজ হয়ে গিয়েছে রিমি। একটু আগে যেমন লাজুকটি ছিল, এখন আর সেটি নেই।
কী আর করা! রুমাল নিয়ে ছুটতে শুরু করল রিমি। সবার পিছন পিছন। আর বলতে লাগল-

'রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।
রুমাল গেল কই?
ওই ওই ওই।'

কিন্তু রুমালটা রিমির মাথায় গেল কেমন করে? সেটা জানে নিপু। কারণ কাজটা নিপুই করেছে। ভাগ্যিস সুযোগ বুঝে রিমির মাথার উপর রুমালটা রেখেছিল। নইলে কি এত সহজে রিমির লজ্জা ভাঙত? আর লজ্জা ভেঙেছে বলেই তো সবার সঙ্গে খেলতে শুরু করল রিমি। ■

তিলু জোকার

ফারহিম ভীনা

এটা আসলে গল্প নয়, সত্যিকারের ঘটনা। আমার ছোটোবেলার ঘটনা। তখন আমাদের শহরে শীত নেমে এলেই মহাসমারোহে আসত সার্কাসের দল। আমরা অবশ্য বছরের শুরু থেকেই অপেক্ষা করতাম কবে আসবে আনন্দ সার্কাস দল। সার্কাস দলের নাম ছিল আনন্দ সার্কাস দল। কিন্তু সেবার হলো কি, আমাদের স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা পিছিয়ে গেল কিন্তু সার্কাসের দল চলে এল ঠিক সময়ে। মানে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগে সার্কাসের সব অ্যাডভেনচার চলবে। পরীক্ষাও শেষ, সার্কাসও শেষ।

শহরে কদিন ধরে মাইকে চলল দারুণ বিজ্ঞাপন। এই শহরে এসে গেছে হই হই আনন্দ! রই রই আনন্দ। আনন্দ সার্কাস দল এসেছে আপনাদেরকে আনন্দ দিতে। এসেছে তিলু জোকারের মজার মজার কাণ্ড।

সত্যিই শহরের চৌমাথার পাশে যে বিশাল মাঠ তাতেই তাঁবু গাড়ল আনন্দ সার্কাস পার্টি। আমারা ক'বন্ধু মিলে নিজেরাই একদিন চলে গেলাম সার্কাস দেখতে। টিকেট কেটে বড়ো মানুষের মতো। স্কুলের টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে টিকেট কাটা। খুব ভয় লাগছে যদি সার্কাসের তাঁবুতে ঢোকার সময় বলে, ওহে তোমাদের বাবা-মা কই? কিন্তু এরকম কিছু হলো না।

দিন শেষে সন্ধ্যা গড়িয়ে এল সার্কাসের তাঁবুর ভেতর যেন স্বয়ং নেমে এসেছে সূর্যদেব। চারপাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ ধাঁধানো হরেক রকম বাতি, বেজে চলেছে নানা ধরনের বাজনা। প্রথমেই কিচ কিচ আওয়াজ তুলে ঢুকল জোকার। আমার পাশে বসা অর্নব ফিসফিস করে বলল, এই সেই তিলু জোকার। এই সার্কাসের সেরা। তাকিয়ে দেখি ছোটো গোল গাপ্পা ছেলেটি। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ওপাশ থেকে ধ্রুব বলল, 'দ্যাখ ও কিন্তু

বামন। ওর গুঁতোয় আমি প্রায় 'উহ্ করে উঠছিলাম।

তাকিয়ে দেখি, সত্যি ছেলেটি নয়, ছোটো তিলু জোকার আসলে বামন। মুখে তার হাসি ছড়িয়েছে গাল পর্যন্ত, চোখে ও মুখে সাদা রং, ঠোঁটে লাল লিপিস্টিক। নাকটাও তার লাল টুকটুকে। পায়ে তার ঘুঙুর। হাঁটলে শব্দ হয় ঝুমুর, ঝুমুর। মাথায় লম্বা চোঙা আকারের টুপি, তার উপরে তারার ফুল। তিলু জোকার মাথা নাড়ার সাথে সাথে ফুলটা কেমন হেলে দুলে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সার্কাসের সব আইটেমেই তিলু জোকার আছে। রিং –এর খেলার জন্য সে মঞ্চে লাফাতে লাফাতে নিয়ে এল এক বালিকাকে। বালিকাও লাফায় কেমন তিড়িং বিড়িং। রিং এর ভেতর চমৎকার লাফ দিলো সে। বাহাদুর বটে। আমরা তারিফ করি।

এরপর তিলু জোকার এল তার টুপি দুলিয়ে। জোকাররা সাধারণত হাসায় কিন্তু তিলু জোকার বিভিন্ন কসরত করে দেখায়। বিচিত্র রঙের বাহারি পোশাক নিয়ে সে দৌড়ে গেল। হঠাৎ সে দড়ির উপর লাফিয়ে উঠতে লাগল বাঁদরের মতো। এত উঁচু দড়ি! কিন্তু তিলু জোকার উঠে যায় যেন সে মই দিয়ে উঠছে। ইস ভয় করে না! সে দড়ি থেকে শুন্যে লাফ দেয় একটি বেঞ্চির উপর। তারপর এমন অঙ্গভঙ্গি শুরু করল যেন তার শরীরে কোনো হাড় নেই। কয়েকবার ডিগবাজি দিয়ে দুই পা দুদিকে টেনে সরল রেখা বানিয়ে বসে পড়ল জিমন্যাস্টদের মতো। এরপর টুপি খুলে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। সার্কাসের তাঁবু উল্লাসে মেতে ওঠে। হাততালিতে ভরে উঠে তাঁবু। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আবার শুন্যে ঝাঁপ দেয়, দড়ি বেয়ে নেমে আসে দ্রুত তিলু জোকার। হঠাৎ পাশেই ঝুলন্ত একটা দোলনা নেমে আসে। তিলু জোকার দড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে এক সময় লাফ দেয়। আমরা সবাই তখন ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলি। পায়ের ঘুঙুরের শব্দ তুলে মাথায় টুপিটা ঘুরিয়ে কেমন লাফ দিয়ে ঝুলন্ত দোলনায় চড়ে বসে। দোলনায় চড়েই শিশুদের মতো খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আবার টুপি খুলে দর্শকদের অভিনন্দন। আনন্দে। নেচে ওঠে, দুলে ওঠে তাঁবু ঘর। তালি আর তালি। সত্যি তিলু জোকারের জুড়ি নেই।

এরপর সার্কাসের কিছু আর ওরকমভাবে টানল না। মনজুড়ে শুধু তিলু জোকারের অবাক কাণ্ড।

একদিন খেলার মাঠ ফেলে বিকেলে আমরা দৌড়ালাম তাঁবু ঘরে। ইচ্ছে তিলু জোকারকে একটু দেখার। জোকার আসলে জাদুকর হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগেও সার্কাসের তাঁবুর পেছনে দারুণ হই চই। সকলে কেমন ব্যস্ত সমস্ত, জোর কদমে হেঁটে চলেছে যেন এখুনি তাদের কোথাও পৌঁছানো চাই। হঠাৎ একজন বয়স্ক বামনকে দেখে ধ্রুব বলে উঠল, দ্যাখ দ্যাখ তিলু জোকার।

আমি তিলু জোকারকে দেখে চমকে উঠি। আমি বুঝে নেই জীবনের চরম সত্য-আসলে আমরা মুখ নয়, মুখোশ দেখি। তিলু জোকারকে কেমন বয়স্ক দেখাচ্ছে। সেই হাসি খুশি মুখটায় দুঃখের গভীর ছায়া। টুপির আড়ালে ঢেকে রাখা মাথাটা আসলে টাক মাথা। আমরা বল খোঁজার ভান করে দাঁড়িয়ে থাকি। সেখানে দাঁড়িয়ে জানতে পারলাম তিলু জোকারের মেয়ে অসুস্থ। এজন্য প্রয়োজন টাকা আর ছুটি। কোম্পানির মালিক রহমান সাহেব আমাদেরকে এক পলক দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এই কারা ওখানে? দ্যাখ তো বাটলু। আহা তিলু। নাম ধরেও ডাকা হয় না আমি দুই বন্ধুকে বললাম, 'দৌড়া। দৌড়া।' আমরা দৌড়ে চলে গেলাম মাঠ পেরিয়ে বড়ো রাস্তায়।

সন্ধ্যায় মা বললেন, আগামীকালের জন্য সার্কাসের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। আমি কেন মাকে বলতে পারলাম না যে আমরা তিনবন্ধু লুকিয়ে সার্কাস দেখে এসেছি। আমার খুব অপরাধী মনে হলো নিজেকে। মা চলে যাচ্ছিল আমি হাত ধরে টেনে বললাম, মা আমি একটা অপরাধ করেছি। তোমার কাছে বলতে পারিনি। আমরা তিনজন লুকিয়ে সার্কাস দেখেছি। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন– যেন তিনি ভুল শুনেছেন। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'সরি মা মণি। আর কখনো হবে না' বলতে বলতে আমার গলা ধরে এল। মা আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর বললেন, আর কখনো লুকিয়ে কোনো কাজ করবে না। হঠাৎ তিলু জোকারের কথা মনে পড়ল। মাকে বললাম, 'জানো মা তিলু জোকারের মেয়ের খুব অসুখ। তিলু

জোকার না মেয়ের চিকিৎসা করতে ওর দেশের বাড়ি চলে গেছে। তিলু জোকার? সে আবার কে? মা অবাক হন। আমি বললাম, বাহ ঐ যে মাইকে বলে না আনন্দ সার্কাস মানেই তিলু জোকার সেই তিলু জোকার। ও তো নেই মা মণি, ওকে ছাড়া সার্কাস একদম ভালো লাগবে না' না এবার তো সবাই মিলে যাব ঠিক ভালো লাগবে। মা সান্ত্বনা দেন।

সার্কাস দেখতে গেলাম আবার। এবার মা আর বাবার সাথে। আশ্চর্য রং চঙে পোশাক পরে কেমন মাথা নেড়ে নেড়ে ঠিক আগের দিনের মতো তিলু জোকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওমা কাল না বলেছিল ওর মেয়ের কঠিন অসুখ। ওদিকে সার্কাস কোম্পানির মালিক দর্শকদের সামনে এসে বিনীত ভাষায় কথা বলে গেলেন। আমি বুঝে গেছি কাল তিলু জোকারের ছুটি হয়নি। আমি আরো বুঝে গেছি এই যে তিলু জোকারের হাসি হাসি চেহারা আর মালিকের বিগলিত চেহারা, এগুলো আসলে মুখ নয় মুখোশ। কাল আমরা তাদের আসল মুখ দেখে ফেলেছি। একের পর এক খেলা চলছে। রিং এর খেলা, ছুরি খেলা, তিলু জোকারের শূন্যে দৌড়ে যাওয়া, ভাসমান দোলনায় হাস্যকর মুখভঙ্গি করে দর্শকদের অভিবাদন জানানো সবই হলো। তাঁবুতে আনন্দের স্রোত বইল। মুগ্ধতায় দর্শক হাততালি দিয়েই যাচ্ছে। মাও হাসছেন, গম্ভীর বাবাটাও হাসছেন আজ। কেবল আমি যেন চোখে কিছুই দেখলাম না। না আমি আর কোনোদিন সার্কাস দেখতে যাইনি। শীতকাল এসে চলে যায়, সার্কাস দল ঘুরে যায়। আমার আর ইচ্ছে করে না সার্কাসের জোকারের মজার অবাক করা দৃশ্য দেখতে। বরং প্রায়ই স্বপ্ন দেখি একজন রংচঙে টুপি আর লাল নাক নিয়ে ছুটে চলেছে রাস্তায়-তার পেছনে তাড়া করছে আমাদের মতো ছেলেমেয়ের দল। ও জোকার মামা আমাদের একটু হাসান না। আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়, আমার আর জোকার মামার চেহারা দেখা হয় না। আমার সামনে ভেসে আসে তিলু জোকারের দুখি চেহারাটা। আমি আর ঘুমুতে পারি না। মুখোশের আড়ালে একটি মুখ আমাকে রাতভর জাগিয়ে রাখে। ■

রেজওয়ান আল রাহাত, ১ম শ্রেণি, স্বরলিপি উচ্চ বিদ্যালয়, মুগদা, ঢাকা

খেলার উচ্চারণ খ্যালা কেন?

তারিক মনজুর

পিলটুদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা ছোটো পুকুর। সেখানে নেহা, বিনু আর পিলটুকে দেখে ভাষা-দাদু থামলেন। বললেন, 'কী করছ তোমরা?'

ওরা তিন জন পুকুরে ঢিল ছুঁড়ছিল। ভাষা-দাদুকে আসতে দেখে চুপ করে রয়েছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। ভাষা-দাদু বললেন, 'এই অবেলায় কী করছিলে তোমরা?'

ভাষা-দাদু বললেন 'অবেলা'। আসলে তখন সকাল এগারোটার মতো বাজে। নেহা এবার সাহস করে বলল, 'দাদু, আমরা খেলছিলাম।'

বিনু আমতা আমতা করে যোগ করে, 'খেলা, মানে ... ইয়ে পুকুরে ঢিল ছুড়ছিলাম।'

দাদু বললেন, 'এই ঢিল ছোড়া নিয়ে ঈশপের একটা গল্প আছে। ... ঈশপ কে জানো তো?'কারো মুখ থেকে উত্তর না পেয়ে ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'ঈশপ ছিলেন গ্রিসের একজন ক্রীতদাস। ... ঈশপের গল্পটা এ রকম: একবার কয়েক জন ছেলে পুকুরে ঢিল ছুড়ছিল। তাই দেখে একটা ব্যাঙ মুখ উঁচু করে বলল, তোমরা কী করছ? ছেলেরা বলল, আমরা খেলছি। তখন ব্যাঙটা বলল, তোমাদের জন্য যেটা খেলা, আমাদের জন্য সেটা মৃত্যুর কারণ।'

পিলটু বলল, 'দাদু, এখানে তো কোনো ব্যাঙ নেই। আমরা এমনিতেই ঢিল ছুড়ে খেলছিলাম।'

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের কোনো কাজ নেই। তাই ঢিল ছোড়া খেলছ। আসো, খেলার উচ্চারণ কেন খ্যালা সেটা বরং দেখাই।'

বিনু বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খেলার উচ্চারণ তো খ্যালাই হবে। খেলার উচ্চারণ মেলা, বেলা তো হবে না।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'কাগজ-কলম হলে ভালো হতো। পুরো ব্যাপারটা লিখে বোঝানো দরকার। এই উচ্চারণের সাথে বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক আছে।'

বিজ্ঞানের কথা শুনে পিলটু ঘরের দিকে দৌড় দিলো। সবাই বুঝতে পারছে, কাগজ-কলম নিয়ে সে আসবে। ভাষা-দাদুও অবস্থা বুঝে পুকুর পাড়ে হিজল গাছের নিচে বসলেন। নেহা-বিনুও দাদুর পাশে বসল। উচ্চারণের মধ্যে আবার কী বিজ্ঞান আছে, ওরা বুঝতে পারছে না। খানিক বাদে পিলটু ফিরল খাতা-কলম নিয়ে। ভাষা-দাদু সাদা পৃষ্ঠায় এ রকম একটা ছক আঁকলেন:

ই		উ
এ		ও
অ্যা		অ
		আ

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' বিনু বলে। ও এমনিতেই একটু ছটফটে।

ভাষা-দাদু বলতে শুরু করলেন, 'এই হলো বাংলা সাতটা স্বরধ্বনি ...'

নেহা বলে, 'হ্যাঁ, দাদু, এর আগে তুমি একবার শিখিয়েছ, বাংলা স্বরবর্ণ ১১টি। কিন্তু স্বরধ্বনি ৭টি।'

দাদু বলেন, 'সাতটি স্বরধ্বনির মধ্যে ই আর উ হলো উচ্চ। এ, ও, অ্যা, অ – এই চারটি হলো মধ্য। আর আ হলো নিম্ন।'

'উচ্চ-নিম্নর ব্যাপার আবার কী?' বিনু জিজ্ঞেস করে।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'উচ্চ-নিম্নর ব্যাপারটা আসলে জিভের। ই আর উ উচ্চারণে জিভ উঁচু হয়, তাই এ দুটি উচ্চ স্বরধ্বনি। এ, ও, অ্যা, অ উচ্চারণে জিভ বেশি উঁচুও হয় না, নিচুও হয় না। তাই এগুলো মধ্য। আর আ উচ্চারণ করলে জিভ নেমে যায়। তাই আ নিম্ন স্বরধ্বনি।'

বিনু তখনও পুরোপুরি উচ্চ-নিম্নর ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ভাষা-দাদু তাই পিলটুকে বললেন, 'পিলটু, আ বলো তো!' পিলটু আ বলল; আর ওর মুখ অনেকখানি হা হয়ে গেল। ভাষা-দাদু বললেন, 'এই দেখ। আ বলার সাথে সাথে ওর জিভ নিচু হয়ে গেছে। তাই আ নিম্ন স্বরধ্বনি।'

বিনু বলল, 'এবার বুঝেছি। ই, উ উচ্চারণ করলে জিভ উঁচু হয়ে যায়।'

'কিন্তু, দাদু, এর সাথে বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক?' পিলটু জানতে চায়। ভাষা-দাদু এবার কাগজে লিখলেন:

লিখ্ + আ = লেখা
কিন্ + আ = কেনা
বেচ্ + আ = ব্যাচা
খেল্ + আ = খ্যালা

লেখা শেষ হলে বললেন, 'আচ্ছা পিলটু, গাছের ডালকে যদি নিচের দিকে টানো, কী হবে?'

পিলটু উত্তর দেওয়ার আগেই বিনু বলল, 'কী আর হবে? নিচের দিকে নামবে!'

ভাষা-দাদু এবার হে হে করে হাসতে লাগলেন, 'এটাই ঘটছে এসব ক্ষেত্রে। আ হলো নিম্ন স্বরধ্বনি। আ-এর টানে লিখ্-এর ই হয়ে যাচ্ছে এ। ফলে উচ্চারণ হচ্ছে লেখা। কিন্-এর ই হয়ে যাচ্ছে এ। ফলে উচ্চারণ হচ্ছে কেনা। আবার আ-এর টানে বেচ্-এর এ হয়ে যাচ্ছে অ্যা। তাই উচ্চারণ হচ্ছে ব্যাচা। খেল্-এর এ হয়ে যাচ্ছে অ্যা। তাই উচ্চারণ হচ্ছে খ্যালা। ... বোঝার জন্য ছকের দিকে আবার তাকাও।'

তিন জন আবার ছকের দিকে তাকালো। উপরে লেখা আছে ই। তার নিচে এ। তার নিচে অ্যা। সবার নিচে আ। ভাষা-দাদু বললেন, 'আ-এর টানে ই হয়ে যায় এ। আ-এর টানে এ হয়ে যায় অ্যা।'

নেহা বলল, 'খেলা শব্দের উচ্চারণ খ্যালা হয়। কারণ পরে আ আছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই!' ভাষা-দাদু বলেন, 'একইভাবে মেলা শব্দের উচ্চারণ ম্যালা হয়। বেলা শব্দের উচ্চারণ ব্যালা হয়।'

'কিন্তু, দাদু, পরে যদি ই থাকত?' পিলটু জিজ্ঞেস করে।

'পরে ই থাকলে কী হতো, আজ আর নাই বলি।' তারপর আড়চোখে একটু উপর দিকে তাকালেন, 'এদিকে বেলাও অনেক হয়েছে!'

ওরা দেখল, সূর্য ঠিক মাথার উপরে চড়েছে। আর হিজল গাছের ছায়াটাও ছোটো হয়ে এসেছে। ভাষা-দাদু উঠে দাঁড়ালেন। বিনু দাদুর হাতে লাঠিটা তুলে দিলো। ■

আমাদের খেলা

রানাকুমার সিংহ

গোল্লাছুট আর লুকোচুরি
গোলাপ-টগর খেলা,
একটা সময় করত রঙিন
মধুর ছোট্টবেলা।

কাঠি ছোঁয়া খেলার মজা
কুমিরডাঙা বলো,
ডাংগুলিতে মন পড়ে রয়
চক্ষু ছলোছলো।

চারঘুঁটি বা কড়ি খেলা
লাটিম, রুমালচোরে,
এক্কা-দোক্কা কড়া নাড়ে
আজ যে স্মৃতির দোরে।

কানামাছি, বদন খেলা
আর হাডুডু আছে,
ঘুড়ির মজা লুটে যেতাম
ষোলোঘুঁটির কাছে।

দেখি না আজ সবার প্রিয়
দড়ি টানাটানি,
বাংলা থেকে যায় হারিয়ে
কত্ত খেলা জানি।

ছোটোবেলার খেলা

নুসরাত জাহান

ছোটোবেলায় খেলেছি কত
মজার মজার খেলা
খেলা নিয়েই কেটে যেত
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

দাঁড়িয়াবান্ধা, কানামাছি, সাতচারা,
মার্বেল, লাটিম আরো কত খেলা
পাড়ার যত ছেলে-মেয়েরা দলবেধে
শুধুই খেলা আর খেলা।

সন্ধ্যা হলেই মা বলতেন
পড়তে বসো বাছা
এমনি করেই পড়াশোনা আর খেলা নিয়ে
কেটে যেত বেলা।

এখনকার ডিজিটাল যুগে
ছেলে-মেয়েরা খেলে না তেমন খেলা
ভার্চুয়াল অনলাইন গেইম আর মোবাইলে
ব্যস্ত সারাবেলা।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খেলা

শাহানা আফরোজ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মানেই ব্যতিক্রমী একটি দিন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাদিন স্কুলের বন্ধু আর শিক্ষকদের সাথে আনন্দ-খেলা করে কাটানোর দিন। বন্ধুরা তোমরাও নিশ্চয়ই এমন একটি দিন বছর শেষে উপভোগ করো। আমাদের শৈশবেও বছর শেষে পরীক্ষার পর একটি দিন নির্ধারিত থাকত খেলার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার পাওয়ার। সারা বছর আমরা অপেক্ষায় থাকতাম এই লোভনীয় দিনটির জন্য। প্রতিযোগিতার দিন সারাদিন চলত খেলা। বন্ধুরা আজ তোমাদের জানাব আমাদের সময়ে স্কুলগুলোতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যেসব খেলার আয়োজন করা হতো। সাথে আছে তোমাদের সময়ের কিছু খেলা।

দৌড়: এ খেলা দিয়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, রিলে রেস হলো দৌড় প্রতিযোগিতার অংশ।

পতাকা দৌড়: এ খেলাটা ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের খেলা। নিদিষ্ট দূরত্বে ছোটো মাপের পতাকা মাটিতে গেঁথে দেওয়া হয়। বাঁশিতে ফু দেওয়ার সাথে সাথে প্রতিযোগীরা দৌড়ে পতাকা তুলে ফিরে আসবে আগের জায়গায়।

বিস্কুট বা চকলেট দৌড়: সুতোয় বেঁধে দেওয়া হয় বিস্কুট। হাত বেঁধে (যাতে হাত দিয়ে কেউ বিস্কুট বা চকলেট না ধরতে পারে) নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড় করানো হয় প্রতিযোগীদের। বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে সবাই দৌড় দিয়ে মুখ দিয়ে বিস্কুট নিয়ে দৌড়ে চলে যাবে অপরদিকে দাঁড়ানো বিচারক আর শিক্ষকদের কাছে। যে আগে যাবে সে প্রথম, তারপরের জন দ্বিতীয় পরেরজন তৃতীয় নির্বাচিত হয়। নিয়ম একই রকম হলেও চকলেট দৌড়ে চকলেট সুতোয় না বেঁধে মাঠে কাগজে আটা, ময়দা, বা তুষ (চালের

বিস্কুট দৌড় খেলা

কুড়া) এর ভিতর লুকিয়ে রাখা হয়। বাঁশি ফুঁ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীরা দৌড়ে গিয়ে বসে মুখ দিয়ে আটার ভিতর লুকানো চকলেট বের করে নিয়ে যাবে বিচারকদের কাছে। খেলা শেষে দেখার মতো হয় প্রতিটি প্রতিযোগীর মুখ।

মোরগ লড়াই: বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই খেলা আয়োজন করা হয়। গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের

মোরগ লড়াই খেলা

কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলা। মোরগ লড়াই খেলায় একদল ছেলে গোল হয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। দুই হাত দিয়ে অপর পা পিছনে ভাঁজ করে রাখতে হয়। রেফারি যখন বাঁশিতে ফুঁ দেন তখনই খেলোয়াড়রা একে অপরকে ভাঁজ করা পা দিয়ে মারতে থাকে। কেউ পড়ে গেলে সে বাতিল বলে গণ্য হয়। এভাবে শেষ পর্যন্ত তিনজন থাকে। তাদের মধ্য থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্ধারণ করা হয়।

বস্তা দৌড়ঃ চাল রাখার খালি বস্তার ভিতর মানে পা থেকে কোমর পর্যন্ত বস্তার ভিতর ঢুকে দৌড় দিতে হয়। এ খেলায় যারা বেশি তাড়াহুড়ো করে তারাই মাটিতে গড়াগড়ি খেত, খেলা আর শেষ করতে পারে না। সবচেয়ে মজা হয় ধুলোমাখা শরীর নিয়ে যখন কেউ মাঠ ছাড়ে আর আশপাশে দাঁড়ানো বন্ধুরা হাততালি আর হাসি, ঠাট্টা করে তার এই হারকে সেলিব্রেট করে।

সুঁইসুতা দৌড়ঃ এটি মূলত মেয়েদের খেলা। সুঁই আর সুতা রাখা হয় কাগজের ওপর। নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়ানো মেয়েরা বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে দৌড়ে এসে কাগজের রাখা সুঁই -এ সুতা লাগিয়ে আবার দৌড়ে চলে হয় বিচারকদের কাছে। যে সঠিকভাবে সুতা লাগিয়ে আগে যাবে সে প্রথম, তারপর দ্বিতীয় এরপর তৃতীয় হয়।

বালিশ বদলঃ এ খেলার নিয়ম হলো সবাই গোল হয়ে চেয়ার পেতে বসবে। মিউজিক বা গানের সাথে সাথে সবার হাতে হাতে ঘুরতে থাকবে একটি বালিশ। মিউজিক বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে যার হাতে বালিশ থাকবে সে বাদ পড়বে। এভাবে শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকবে তাদের মধ্যে থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় তার আগে যে বাদ বা আউট হয়েছিল সে তৃতীয় নির্বাচিত হবে।

মিউজিক্যাল চেয়ার : এ খেলা বালিশ বদলের মতো। খেলোয়াড় অনুপাতে এখানে একটি আসন মানে একটি চেয়ার কম দেয়া হয়। যাতে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়। মিউজিকের তালে তালে চেয়ারের পাশে ঘুরঘুর করতে হবে। যেই মিউজিক বন্ধ হবে, সেই চেয়ারে বসে যেতে হবে। মিউজিক বন্ধ

বস্তা দৌড় খেলা

হয়েছে অথচ দাঁড়িয়ে আছে বা চেয়ারে বসতে পারলে না, তার মানে আউট। এভাবে একে একে আউট হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কেবল একটা চেয়ার থেকে যায়। চেয়ার একটি কিন্তু খেলোয়াড় দুজন। সেই অমূল্য চেয়ারে যে বসতে পারে সেই ছিনিয়ে নেয় বিজয়!

অঙ্ক দৌড় খেলা

অঙ্ক দৌড়ঃ মূলত এটি বুদ্ধিমত্তার খেলা। এই খেলার নিয়ম হচ্ছে প্রতিযোগীদের উপযোগী দুই/তিন সারির যোগ অঙ্ক ছোটো ছোটো কাগজে লিখে প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে যে অঙ্কটি শুদ্ধ করে আগে দৌড়ে মাঠের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বিচারকের কাছে পৌঁছতে পারবে, সে-ই হবে প্রথম, তারপর যে পৌঁছাবে সে দ্বিতীয় তারপর তৃতীয়।

তিন পায়ে দৌড়/ জোড়া পায়ে দৌড়ঃ এই খেলায় দুজনের পা মানে একজনের ডান পা অন্যজনের বাম পা বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে দৌড়ে চলে যেতে হয় বিচারকদের কাছে। এ খেলাটা অনেক কষ্টের। অনেকেই পড়ে যায় মাঝ রাস্তায়। তারা আউট বা বাদ হয়ে যায়। যারা তিন পায়ে লাফিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারে তাদের মধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্ধারিত হয়।

হাড়ি ভাঙা খেলা

কাক উড়ে, মাছ উড়েঃ এ খেলাটি খুব মজার। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে লাইন ধরে কখনো বা গোল হয়ে দাঁড়ায়। সামনে একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে বলবে, কাক উড়ে সাথে সাথে ছেলে-মেয়েরা পাখা নাড়ানোর মতো অভিনয় করবে। আবার হয়ত বলল গরু উড়ে তখন যদি কেউ হাত নাড়ায় তবে সে বাদ। মূল কথা হলো যেসব প্রাণী উড়ে সেগুলোর নাম বললে হাত নাড়তে হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত যারা টিকে থাকবে তারাই হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

রশি টানাটানিঃ হাততালি আর আনন্দে ভরপুর খেলা রশি টানাটানি। একটি বড়ো রশি আর দুই পক্ষ। বাঁশি ফু দেওয়ার সাথে

সাথে রশির দু'পাশ দুই পক্ষ ধরে টানতে থাকে। যে পক্ষের জোর বেশি থাকে সেই পক্ষে রশি বেশি যায় আর তারা জিতে যায়। একসময় দেখা যায় অতিথিরাও এ খেলায় যোগ দেয়। আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই।

হাঁড়ি ভাঙা: এটিও মূলত মেয়েদের খেলা। আনন্দে ভরপুর এ খেলায় প্রতিযোগীর চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীর কিছুটা দূরত্বে থাকে হাঁড়ি। হাতে দেওয়া হয় লাঠি। চোখ বাঁধা অবস্থায় আন্দাজ করে গিয়ে হাঁড়িটি লাঠি দিয়ে ভাঙতে হয়। দেখতে পায় না তাই কোনো কোনো প্রতিযোগী হাঁটতে হাঁটতে মাঠের অন্যপ্রান্তে চলে যায়। আর দর্শকদের হাসির খোরাক হয়। এভাবেই যে হাঁড়ি ভাঙতে পারে তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়।

পাঞ্জা লড়াই: অনেক সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শক্তির পরিমাপ করার জন্য পাঞ্জা লড়াই হয়। দুজনের দুই হাতের পাঞ্জা দিয়ে শক্তি পরীক্ষা করা হয়। টেবিরের দুপাশে দুজন বসে এক হাত পিছনে দিয়ে আরেক হাতের কনুই টেবিলে রেখে পাঁচ আঙুল দিয়ে যুদ্ধ হয়। যার পাঞ্জা পাশে ফেলে দেয়া যায় সে হেরে যায়।

এছাড়া দড়িলাফ, ব্যাঙ দৌড়, দীর্ঘ লম্ফ, উচ্চ লম্ফ, চেয়ার খেলা, কলস বা হাঁড়ি মাথায় দৌড়, চামচে মার্বেল ইত্যাদি খেলাও থাকে প্রতিযোগিতায়। বিদ্যালয় ক্রীড়া কমিটি বিবেচনা করে খেলা নির্বাচন করে, কারণ একদিনে সব খেলা সম্ভব নয়।

এভাবেই কখন যে শেষ হয় আনন্দের দিনটি খেয়ালই থাকে না। দিনশেষ হলেও তার রেশ থাকে অনেকদিন। আর অপেক্ষার পালা শুরু হয় পরের বছরের জন্য। ■

কাশফিয়া আক্তার, ৪র্থ শ্রেণি, রেডিও কলোনি মডেল স্কুল, সাভার, ঢাকা

অবসরের খেলা

কামরুল হাসান

পড়ার ফাঁকে, ছোটোদের কাজের ফাঁকে বড়োদের অবসর কাটাতে কার না ভালো লাগে। আর তা যদি হয় পারিবারিক আবহে বা বন্ধুদের সাথে খেলায় খেলায় মেতে কেমন হয় বন্ধুরা। সেরকম দুটি খেলার সাথে পরিচিত হও।

দাবা : দাবা একটি জনপ্রিয় খেলা যা বোর্ড বা ফলকের উপর খেলা হয়। দাবা খেলার সর্বপ্রথম সূচনা হয় ভারতবর্ষে। দাবায় দু'জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। দাবা খেলায় জিততে হলে বোর্ডের ওপর ঘুঁটি সরিয়ে বা চাল দিয়ে বিপক্ষের রাজাকে কোণঠাসা করে এমন স্থানে আনতে হয় যেখান থেকে রাজা আর স্থানান্তরিত হতে পারে না, দাবার পরিভাষায় একে বলে 'কিস্তিমাত' (ইংরেজিঃ checkmate)। দাবা বোর্ডে বর্গাকৃতি ৬৪টি সাদা-কালো ঘর থাকে। ঘরগুলোতে প্রতিটি খেলোয়াড়ের একটি করে রাজা, মন্ত্রী, দু'টি করে নৌকা, ঘোড়া, হাতি এবং ৮টি করে সৈন্য বা বোড়ে সহ মোট ১৬টি ঘুঁটি থাকে। অর্থাৎ দুজন খেলোয়াড়ের সর্বমোট ৩২টি ঘুঁটি থাকে।

রস-কস-সিঙ্গারা-বুলবুলি-মস্তকঃ মজার খেলা রস-কস-সিঙ্গারা-বুলবুলি-মস্তক। এই খেলা সর্বোচ্চ চারজনে খেলা যায়। সবাই নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কেউ রস, কেউ কস, কেউ সিঙ্গারা, কেউ বুলবুলি বেছে নেয়। তারপর পিছন থেকে হাত টেনে এনে রস-কস সিঙ্গারা-বুলবুলি-মস্তক বলতে বলতে হাত উপুড় করে মাটিতে বিছিয়ে দেয়। কারো দুই হাত কারো আবার এক হাত। তবে দুই হাতের যে আঙুল খুশি খোলা বা বন্ধ রাখতে পারে। এরপর সবার আঙুল গোনা হয় রস-কস-সিঙ্গারা-বুলবুলি-মস্তক বলে। সব শেষ আঙুলে যে নাম উঠবে সে নিরাপদ থাকল। এভাবে একে একে অন্যরাও নিরাপদ হলে সবশেষে যে রয়ে গেল সেই চোর হয়। এরপর সে হাতের তালু পাথালি করে

রস-কস-সিঙ্গারা-বুলবুলি-মস্তক খেলা

মাটিতে রাখবে আরেকজন সেই হাতে মারবে। যে মারছে সে যদি তিনবার মারতে গিয়ে না পারে তবে নতুন করে আবার শুরু হয়।

চোর-ডাকাত-পুলিশঃ শৈশবের সবচেয়ে প্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে একটি হলো চোর-পুলিশ খেলা। এ খেলা সাধারণত ৪ জন খেলে কখনো বা পাঁচ জনও খেলে। একটি সাদা পৃষ্ঠা সমান মাপের কয়েক টুকরা কাগজ ও কলম দিয়েই খেলা শুরু করা যায়। প্রথমত কাগজ ছিঁড়ে টুকরো করে তাতে বিভিন্ন নাম ও নাম্বার লিখতে হয়। যেমন- চোর- ৪০০, ডাকাত- ৬০০, পুলিশ-৮০০, দারোগা- ১০০০, বাবু- ১২০০। পাঁচজনের বেশি হলে পকেটমার, ছিনতাইকারী ইত্যাদি নাম দিয়েও খেলা যায়। নাম ও নাম্বার লিখে কাগজগুলো সমানভাবে কেটে সেগুলোকে একইভাবে ভাঁজ করতে হয়।

পাঁচগুটি খেলা

এরপর একটি পৃষ্ঠায় খেলোয়াড়দের নাম লিখে স্কেল দিয়ে রোল করে নিতে হয়। এবার খেলা শুরু।

ছোটো ছোটো ভাঁজ করা কাগজগুলো এ হাত ও হাত করে মাটিতে ফেলে। সবাই একটা করে কাগজ তুলে নেয়। এর মধ্যে যে পুলিশ পায় তাকে দারোগা হুকুম দেয় পুলিশ কোন হ্যায়, পুলিশ বলে হাম হ্যায়, তখন দারোগা পুলিশকে বলে, চোরকে পাকড়াও। দারোগার নির্দেশমতে পুলিশ যদি সঠিকভাবে ধরতে পারে তবে যাকে পাকড়ায় সে জিরো পায় আর যদি ভুল বলে তবে পুলিশ জিরো পায়। এভাবে যে যেই কাগজ পায় সে কাগজের নাম্বার প্রত্যেকের নামের ঘরে লিখতে হয়। পুরো পৃষ্ঠা ভরে গেলে নাম্বার গণনা করা হয়। যে সর্বোচ্চ নাম্বার পায় সে প্রথম, তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় নির্ধারণ করা হয়। ■

মেয়েদের গ্রামীণ খেলা

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্যবাহী লোকজ খেলাগুলো আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আজকে আমরা মেয়েদের দুটি জনপ্রিয় খেলার সাথে পরিচিত হব।

ফুলটোকাঃ ফুলটোকা বাংলাদেশের গ্রামীণ কিশোরীদের প্রিয় খেলা। বাড়ির আঙিনা কিংবা স্কুলের মাঠে মেয়েরা ফুলটোকা খেলে থাকে। দল নেতাসহ দুই দলে ভাগ হয়ে কিছুটা দূরত্বে মুখোমুখি হয়ে বসে এই খেলা শুরু করতে হয়। দুই দল নিজেদের খেলোয়াড়দের নাম ফুল অথবা ফলের নামে রাখে। দলপতি অপর পক্ষের যে-কোনো খেলোয়াড়ের চোখ দু-হাতে চেপে ধরে সাংকেতিক নামে তার যে-কোনো একজন খেলোয়াড়কে ডাকে। ওই খেলোয়াড় এসে চোখ ধরে রাখা খেলোয়াড়ের কপালে আলতো করে টোকা দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। চোখ খোলার পর ওই খেলোয়াড়কে কে টোকা দিয়েছে তা বলতে হয়। বলতে পারলেই রয়েছে লাফ দিয়ে সামনে যাবার সুযোগ। এভাবে যে দলের খেলোয়াড়রা লাফ দিয়ে প্রথমে নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করতে পারে সে দল জয়ী হয়।

দড়ি লাফঃ গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে যতগুলো পরিশ্রমের খেলা আছে, তার মধ্যে দড়ি লাফ অন্যতম। দড়ি লাফ খেলার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এক টুকরো করে দড়ি। দড়িটি হতে হবে একটু ভারী, ভালোভাবে পাকানো ও শক্ত। গ্রামে গরু বা ছাগল যে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় কিশোরীরা সাধারণত ঐ দড়ি সংগ্রহ করে দড়ি লাফ খেলা খেলে থাকে। তবে এখন দড়ি লাফ খেলার জন্য চমৎকার দড়ি বা রশি দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। ■

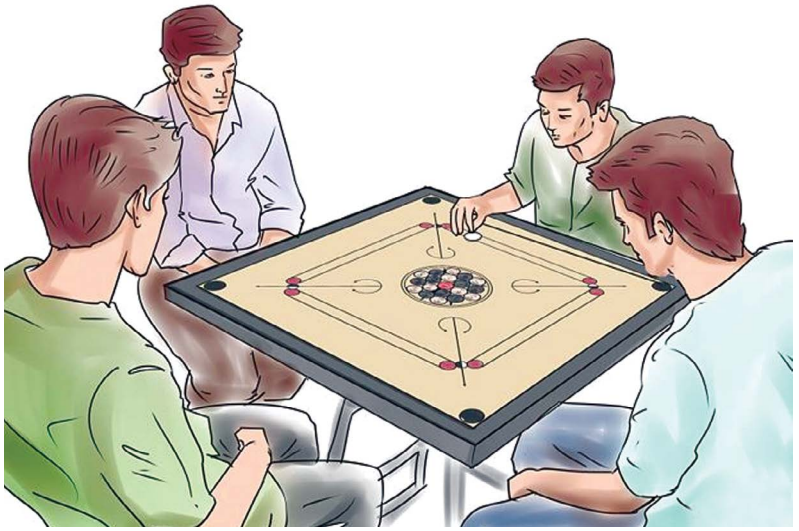

আরো কিছু খেলা

ফারহানা মুকসিত

উচ্চ লম্ফ বা হাই জাম্প : উচ্চ লম্ফ হলো ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট যেখানে প্রতিযোগীদের মাপা উচ্চতায় স্থাপন করা একটি অনুভূমিক দণ্ডের উপর দিয়ে, কোনো সাহায্য ছাড়া ঝাঁপিয়ে যেতে হয়, দণ্ডটিকে না ফেলে। দুটি উল্লম্ব দণ্ডের মধ্যে একটি আনুভূমিক দণ্ড স্থাপন করা হয় এবং ঝাঁপিয়ে পরার জন্য একটি নিরাপদ মোটা গদি থাকে। খেলোয়াড়রা দণ্ডের দিকে ছুটে যায় এবং ফসবারি লাফ পদ্ধতিটি ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিতে মাথা প্রথমে এগিয়ে যায় এবং পিঠের দিকটি দণ্ডের দিকে থাকে।

দীর্ঘ(লং) লম্ফ : দীর্ঘ লম্ফ একটি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড প্রতিযোগিতা যেখানে প্রতিযোগীরা শুরুর বিন্দু থেকে যতদূর সম্ভব লাফানোর চেষ্টা করে। প্রতিযোগীরা একটি পথ ধরে দৌড়ায় এবং একটি কাঠের পাটাতন থেকে তারা যতদূর পারে লাফ দেয় বালি দিয়ে ভরা গর্তে। প্রতিযোগী নিষিদ্ধ রেখার পিছনে যে- কোনো বিন্দু থেকে লাফ শুরু করতে পারে; পরিমাপ করা দূরত্বটি হবে, দেহ বা পোশাকের কোনো অংশের দ্বারা সৃষ্ট বালির ওপর সবচেয়ে কাছের দাগ থেকে নিষিদ্ধ রেখার সাথে লম্ব দূরত্ব।

ক্যারাম : আমেরিকায় ১৮৯০ সালে শিক্ষক হেনরি হাস্কেল প্রচলিত ক্যারাম নিয়মের বদল এনেছিলেন। আজও এই ধরনের ক্যারাম খেলার রীতি আছে। আইসিএফের রুলস বুক অনুসারে ক্যারাম বোর্ডের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন ৭৩.৫০ সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ ৭৮ সেন্টিমিটার। প্রত্যেকটি পকেটের ব্যাস ৪.৪৫ সেন্টিমিটার। ১৯টি ঘুঁটির মধ্যে ৯টি সাদা, ৯টি কালো ও একটি লাল। ক্যারামের ঘুঁটিগুলোর রং অনুযায়ী পয়েন্ট। লাল রঙের ঘুঁটি যেটাকে আমরা রেড বলি তার পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি। আইসিএফের নিয়ম অনুযায়ীও রেডকে কুইন বলা হয়।

সাঁতার : সাঁতার এক ধরনের জলক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গ্রামের পুকুরে বা জলাশয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এই খেলায় পটু হয়ে উঠে অনেকেই। প্রতিযোগীরা নির্দিষ্ট দূরত্বে দ্রুত অতিক্রমের জন্য চেষ্টা করে। যিনি সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তিনি সাঁতারু নামে অভিহিত হন। প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে প্রতিযোগীর শরীরকে ঢেকে রাখতে ও গতিবেগ বাড়াতে বিশেষ ধরনের সাঁতারের পোশাক ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

বর্শা নিক্ষেপ : ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের একটি খেলা বর্শা নিক্ষেপ। প্রধান উপকরণ হিসেবে থাকে বর্শা। এটি ২.৫ মি. (৮ ফুট ২ ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। বর্শা নিক্ষেপকারী দৌড়ে গিয়ে গতিপ্রাপ্ত হয়ে পূর্ব-নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বর্শাটিকে নিক্ষেপ করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্শা এক ধরনের অস্ত্র ছিল। বর্শা হাতে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

তীর-ধনুক খেলা : প্রাচীনকালে তীর বা ধনুক ব্যবহার করে পশু শিকার করা হতো। তীর-ধনুক খেলা এখন আর্চারি হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সারা বিশ্বে। যিনি তীর-ধনুক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তিনি তীরন্দাজ বা আর্চার বা বোম্যান নামে পরিচিত। আর্চারি ইনডোর এবং আউটডোর উভয় ক্ষেত্রে খেলা হয়ে থাকে। একজন প্রতিযোগীকে ২ মিনিটে ৩ থেকে ৬টা তীর ছুড়তে হয়। টার্গেটের কোথায় আঘাত করেছে তার উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট দেওয়া হয়। ■

খেলায় বাংলাদেশের রেকর্ড

রাকিব হাসান

গিনেস বিশ্ব রেকর্ড ইংরেজি Guiness World Records যা ২০০০ সাল থেকে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' নামে পরিচিত। এটি একটি বার্ষিক প্রকাশনা বিশেষ। বিশ্বের সকল প্রকার রেকর্ড সংরক্ষণ করার আন্তর্জাতিক ও অত্যন্ত জনপ্রিয় বই এটি। এই গিনেস বুকে সব দেশের মতো বাংলাদেশি অনেকের নাম স্থান পেয়েছে। এই বুক –এ বাংলাদেশিদের কিছু খেলায় রেকর্ড গড়া সম্পর্কে আজ তোমাদের জানাব।

টেবিল টেনিস সম্রাজ্ঞী

গিনিস বুকে যার হাত ধরে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নামটি এসেছে তিনি হলেন বিস্ময়কর টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জোবেরা রহমান লিনু। টেবিল টেনিসের সম্রাজ্ঞী হিসেবেই তিনি সবার কাছে পরিচিত।

২০০২ সালের ২৪শে মে জোবেরা রহমান প্রথম বাংলাদেশি ক্রীড়াবিদ হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখান। বাংলাদেশের ক্রীড়া জগতের জীবন্ত কিংবদন্তী জোবেরা রহমান। জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ১৯৭৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে এই সম্মাননা অর্জন করেন তিনি।

ফুটবলে হ্যাটট্রিক রেকর্ড

গিনেস রেকর্ড এক স্বপ্নের নাম। বগুড়ার সন্তান আব্দুল হালিম শুধু একবার নয়, গিনেস রেকর্ডে তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। ২০১১ সালে ফুটবল মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রথম বিশ্ব রেকর্ড গড়েন তিনি। এরপর ২০১৫ সালে দ্বিতীয় রেকর্ড গড়েন। তিনি ২৭.৬৬ সেকেন্ড সময় মাথায় বল নিয়ে রোলার স্কেটিং জুতা পড়ে ১০০ মিটার অতিক্রম করে ২য় রেকর্ড গড়েন। এরপর হ্যাট্রিক রেকর্ড করেন ২০১৭ সালের ৮ই জুন শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে মাথায় বল নিয়ে সাইকেল চালিয়ে। ১৩ দশমিক ৭৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি হ্যাটট্রিক রেকর্ড গড়েন। 'গ্রেটেস্ট ডিসট্যান্স ট্র্যাভেলড অন এ বাইসাইকেল ব্যালেন্সিং : এ ফুটবল অন হেড' ক্যাটাগরিতে রেকর্ড গড়ে হ্যাটট্রিক করেন তিনি।

এক লেনে সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড

১,১৮৬ জন বাংলাদেশি সাইক্লিস্ট এক লেনে সাইকেল চালিয়ে বিশ রেকর্ড গড়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড–এ স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজেদের এমন অর্জনে দারুণ আনন্দিত বিডি সাইক্লিস্ট। ২০১৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের ৪৫ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে এ আয়োজন করা হয়। ১,১৮৬ জন সাইক্লিস্টকে নিয়ে 'সিঙ্গেল লাইন রাইড'–এর আয়োজন করেছিল বিডি সাইক্লিস্ট নামের একটি সংগঠন।

নিজের রেকর্ড ভাঙলেন ফয়সাল

গিনেস বুকে দ্বিতীয়বারের মতো নাম লিখিয়েছেন ১৭ বছরের মাহমুদুল হাসান ফয়সাল। ফ্রি স্টাইলে বাস্কেটবল নিয়ে শারীরিক কসরত দেখিয়ে গিনেস

বুকে নাম লেখান তিনি। ২০১৯ সালের এপ্রিলে মাত্র ৬০ সেকেন্ডে দুই হাতের মধ্যে ১৪৪ বার বাস্কেটবল ঘুরিয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে দ্বিতীয়বারের মতো নিজের নাম লিখিয়েছেন মাহমুদুল। এর আগে ২০১৮ সালে ৬০ সেকেন্ডে দুই হাতের মধ্যে ১৩৪ বার ফুটবল ঘুরিয়ে প্রথমবার রেকর্ড করেছিলেন তিনি। এছাড়া ১ মিনিটে ৩৪ বার বাস্কেটবল ঘাড়ের উপর নাচিয়ে গিনেস বুকে রেকর্ড করেছে সে। ২০১৯ সালের ২৯শে আগস্ট-এ স্বীকৃতি দেয় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস।

জুবায়েরের রেকর্ড

'নেক থ্রো অ্যান্ড ক্যাচ' ক্যাটাগরিতে অর্থাৎ কাঁধ দিয়ে ফুটবলকে শূন্যে ভাসিয়ে আবার কাঁধের ওপর নিয়ে আসার ফ্রি স্টাইলে ৩০ সেকেন্ডে ৩৩ বার করেছে ঝালকাঠির আশিকুর রহমান জুবায়ের। এটি তার দ্বিতীয়বারের মতো গিনেস বুকে নাম লেখানো।

২০শে সেপ্টেম্বর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড কর্তৃপক্ষ জুবায়েরকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে ২০১৯ সালে জুবায়ের ৬০ সেকেন্ডে ৬৫ বার ফুটবল ফ্রি স্টাইল করে প্রথম রেকর্ড করে গিনেস বুকে তার নাম লিখে ঝালকাঠিবাসীকে গর্বিত করেন। ■

খেলার স্মৃতি

মো. কামরুজ্জামান

খেলেছি কত মজার খেলা
পাড়ার অলিগলিতে দল বেধে
গোল্লাছুট ফুটবল সাতচারায় মজে
গিয়েছি নাওয়া খাওয়া সব ভুলে।

আনন্দ আর খেলাধুলার
দিনগুলো শুধুই এখন স্মৃতি
এখনো রয়ে গেছে মনের মাঝে
সেই সব খেলার প্রীতি।

বাবার শাসন মায়ের বকুনি
খেয়েছি কত খেলার জন্য
প্রিয় খেলাগুলো খেলতে পেরেছি বলে
হয়েছে জীবন ধন্য।

জয়ের সুবাস

শাহজাহান মোহাম্মদ

টাইগারদের গর্জনে
কাঁপছে এখন বিশ্ব
ঘূর্ণি বলের তোপে পড়ে
প্রতিপক্ষ নিঃস্ব।

সাকিব মুশফিক মাহমুদউল্লার
ব্যাটিং জাদুর ছলে
বয়োবৃদ্ধ শিশু-কন্যা
হাসছে মায়ের কোলে।

হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে
জয়ের উল্লাস মেখে
বাংলাদেশকে এগিয়ে নিবো
এই প্রত্যয় রেখে।

শাবাশ শাবাশ বাঘের দল
আমরা আছি পাশে
বিজয় সুবাস এল আবার
স্বাধীনতার মাসে।

মজার খেলা

হাফিজুর রহমান

খেলা মানেই মজা আর আনন্দ। তবে কিছু খেলা খেলতে যেমন ভালো লাগে। দর্শক হিসেবে দেখতেও ভালো লাগে। এমনই কিছু মজার খেলা সম্পর্কে তোমাদের জানাবো।

রুমাল চুরি: সব বন্ধুরা মিলে গোল হয়ে বসে খেলতে হয় এই খেলাটি। প্রথমে একজন 'চোর' হয়, অন্যেরা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। চোর হাতে রুমাল নিয়ে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে সুবিধামতো একজনের পেছনে অলক্ষে সেটা রেখে দেয়। সে টের না পেলে চোর ঠিক পিছনে এক পাক ঘুরে এসে তার পিঠে কিল-চাপড় দেয়। আগে টের পেয়ে গেলে বা পরে মার খেয়ে রুমাল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার সে হয় চোর আর তার শুন্য জায়গায় বসে পড়ে আগের খেলোয়াড়।

চাকা খেলা: চাকা খেলা ছোটোবেলার দারুণ মজার খেলা। যে-কোনো বৃত্তাকার জিনিস যেমন সাইকেল বা রিকশা অথবা মোটর সাইকেলের টায়ার, কখনো বা বাঁশের চটি দিয়ে বানানো বৃত্ত বা গোলাকার ধরনের কিছু নিয়ে দৌড় খেলা। সময়-অসময় নেই মাঠঘাট, প্রান্তর ছাড়িয়ে এই খেলার কোনো সীমানা ছিল না। চাকা নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়ানো ছিল প্রতিদিনের বিনোদন আর শরীরচর্চার একটা অংশ। একটি ছোটো লাঠি দিয়ে এই চাকাতে আঘাত করলে তা চলতে শুরু করত। সাথে সাথে দৌড়ও দিতে হয়।

হাঁস খেলা: মজা আর আনন্দের খেলা এটি। খেলতে লাগে হাঁস আর পুকুর বা নদী। যারা সাঁতার জানে তাদের জন্যই এই খেলা। যত খেলোয়ার তত মজা। সবাই পুকুরে নামার পর তাদের ধরার জন্য একটি হাঁস ছুড়ে দেওয়া হয় আর যখনই হাঁস পানিতে পরে সবাই ছুটে আসে ধরার জন্য। কিন্তু এতই কি সোজা। হাঁসও ধরা দেয় না আর সবাই সাঁতরে বেড়ায় হাঁসের পিছনে পিছনে। পুকুর পাড়ে যারা থাকে তারা আবার হাঁসকে তীরে উঠতে দেয় না। এভাবে চলতে থাকে খেলা। এক সময় হাঁস ধরা পরে কারো না কারো হাতে। তখনই শেষ হয় খেলা। যে হাঁস ধরে সে হয় বিজয়ী।

ব্যাঙ লাফ: মজার এক খেলা ব্যাঙ লাফ। একটু যাদের বয়স কম তারা এই খেলা খেলে দারুণ মজা পায়। ব্যাঙের মতো সেজে মানে বসে (বসবে কিন্তু শরীর মাটিতে লাগবে না)হাত দিয়ে পায়ের টাখনু (গোড়ালির একটু উপরে) শক্ত করে ধরতে হয়। তারপর দিতে হয় লাফ। খেলতে অনেক জোড় লাগে। লাফ দিতে গিয়ে অনেকে মাটিতে গড়াগড়ি যায় আর ধুলো মেখে মায়ের বকুনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই খেলাটা অনেক সময় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হতো। কোথাও আবার পানি ঝুপ্পা বা ব্যাঙ লাফানো খেলা অন্যরকম। পানিতে না নেমেই খেলা যায় এই খেলাটি। এটি খেলতে দরকার পুকুর বা নদী বা খালবিল। পাতলা চ্যাপটা মাটির টুকরা, ভাঙা হাড়ির চারা বা খোলামকুচি ডাঙা থেকে হাতের কৌশলে পানির ওপর ছুঁড়ে মারা হয়। চারাটি ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে গিয়ে ডুবে যায়। কয়েকজন মিলে প্রতিযোগিতা না করলে খেললে খেলাটি জমে না। পানির ওপর দিয়ে চাড়াটি ছুটে যাবার সময় কতবার লাফ দিল এবং কত দূরে গেল, তার ওপরই নির্ধারিত হয় হার-জিৎ। ■

নির্দিষ্ট স্পাইক প্রোটিনকে আটকে রেখে অকার্যকর করে দিতে পারে।

সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনিকা বলেছে, 'এ আবিষ্কারের ফলে চলমান মহামারি শেষ হওয়ার আশা জেগেছে আমাদের সবার মধ্যে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য এ আবিষ্কার কাজে দেবে'। ■

করোনা প্রতিরোধে কিশোরীর আবিষ্কার

জান্নাতে রোজী

করোনা ভাইরাসের মহামারীতে পুরো বিশ্বই এখন কার্যত বিপর্যস্ত, করোনার কার্যকর টিকার পাশাপাশি আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন নিরলসভাবে। এমনই এক সময়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৪ বছরের এক কিশোরী আবিষ্কার করে ফেলল এই ভাইরাসকে অকার্যকর করে দিতে পারে এমন এক অণু। কিশোরীর নাম অনিকা শেব্রোলু। করোনা চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করে সে জিতে নিয়েছে ২০২০ সালের 'থ্রিএম ইয়াং সায়েন্টিস্ট চ্যালেঞ্জ পুরস্কার'। সম্মাননা হিসেবে পেয়েছে ২৫ হাজার মার্কিন ডলার। ২০শে অক্টোবর বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায় এ খবরটি ছাপা হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএএনের খবরে বলা হয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফ্রিসকোতে মা-বাবার সঙ্গে থাকে। পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ওই স্কুল ছাত্রী একটি অণু (মলিকিউল) তৈরি করেছে, যেটি করোনা ভাইরাসের

খেলা

মো. আবু বকর

হারিয়ে গেছে অনেক খেলা
মার্বেল, টিপু, ডাংগুলি আর লাঠি
জাতীয় খেলা হাডুডু-তে
চৌদ্দজন লাগে সাথি।

হাডুডু খেলার আরেক নাম
কাবাডি বলে জানি
খেলাধুলা করলে সুস্থ থাকবে
এ কথাটা অতি দামি।

সুস্থ শরীর সুন্দর মন
গড়ে তোলে এই খেলা
লেখাপড়ার ফাঁকে করবে খেলা
করো না কেউ হেলা।

দ্বাদশ শ্রেণি, বাগাতিপাড়া ডিগ্রি কলেজ, নাটোর

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

অ্যাডহক প্রকাশনা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

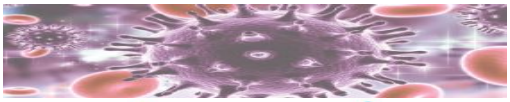

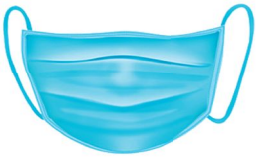

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-5, November 2020, Tk-20.00

রাফান ইবনে মেহেদী, ৪র্থ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা